# বিবিধ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

# বিবিধ

## সূচী

# বাল্যরচনা

হুগলি কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার সূত্রপাত হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' কবিতা লিখিতেন; দুই-একটি গদ্য-রচনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক পরিচালিত 'সমাচার দর্পণে'ও তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

# পদ্য

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ ]

হুগলি কালেজস্থ ছাত্রের লিখিত পদ্য অবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

পদ্য।

চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি॥
প্রিয়া প্রতি পতি তার, করিছে উত্তর।
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্তর॥

**প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি।**
**দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর।**

পয়ার।

স্ত্রীং। কহ না কি হেতু, কান্ত, শশী অস্তে চলে।
পং। তব মুখে মূক হোয়ে, চলে অস্তাচলে॥
স্ত্রীং। দশদিগ্ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়।
পং। তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময়॥
স্ত্রীং। কি হেতু কোকিলকুল, কুহু কুহু করে।
পং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে॥
স্ত্রীং। সে রবে কি হেতু প্রাণ, হোয়েছে বিকল।
পং। আমারে নির্দ্দয় বোলে, পাও প্রতিফল॥
স্ত্রীং। গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্রমে কি কারণ।
পং। তব মুখপদ্মগন্ধ, করিবে গ্রহণ॥
স্ত্রীং। অনিল অনল সম, কেন হয় জ্ঞান।
পং। পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ॥
স্ত্রীং। ' সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমণি।
পং। ভাবের এমনি ভাব, এ ভাব এমনি॥

স্ত্রীং। তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই।
পং। দেহে যদি নই, কিন্তু, অন্তরেতে হই॥
স্ত্রীং। কেন পতি, দিনপতি, উঠিছে গগনে।
পং। ওমুখ নলিনী ফুল্ল, করণ কারণে॥
স্ত্রীং। কোথায় যাইছে সব, মধুকরগণ।
পং। বদন কমল তব, করে অন্বেষণ॥

শ্রীব, চ, চ,।

উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রবীণ কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে, এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। প্রং সম্পাদক।

[ 'সমাচার দর্পণ,' ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ ]

## বিরলে বাস।

শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কএক পঁক্তি আপনকার দর্পণে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।
যেই জন বাস করে সুখী সেই জনে॥

সেই নির্জন বটে কিন্তু একা নয়।
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয়॥

কতমত কাণাকাণি রাজার গোচরে।
ভালকে অবজ্ঞা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে॥

তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট, পক্ষির বিলাপ।
বিয়োগিনী পক্ষিণীর, কঠোর সন্তাপ॥

তুচ্ছ মান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।
তাহা হতে মলয়জে, মিষ্ট বলা যায়॥

আর মিষ্ট নবপুষ্পে সুগন্ধি পবন।
ধন বিষ হতে মিষ্ট, নদীর জীবন॥

চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার।
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকার ॥*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৮ মে ১৮৫২ ]

## জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য।

চৌপদী।

যামিনী যামেক যায়, সেবিতে শীতল বায়,
সঙ্গে করি ললনায়, রসময় বসিয়া।
বসি নিশাকর করে, ধরিয়ে প্রেয়সীকরে,
প্রেম আলাপন করে, সরসেতে রসিয়া ॥
শুন ওলো প্রাণেশ্বরি, তব মুখ রূপ ধরি,
ওই কি গগনোপরি, রূপে মনো হরে লো।
বুঝি বা সে শশী হবে, বুঝিলাম অনুভবে,
নহিলে কে আর তবে, হেন রূপ ধরে লো ॥
কিম্বা তব মুখ ছায়া, ধরি তব মুখ কায়া,
গগনে শোভিল গিয়া, আলো করি করে লো।
তা নয় তা নয় সখি, উহাতে কলঙ্ক লখি,
কলঙ্ক তো না নিরখি, ও মুখ উপরে লো ॥
যদি তব মুখোপরে, সে কলঙ্ক না বিহরে,
রবে তো কেমন কোরে, ছায়ার ভিতরে লো।
দেখ লো নয়ন তারা, গগনে যতেক তারা,
কত শোভা করি তারা, সুখেতে বিহরে লো ॥
যেন তব নেত্রবর, তারা হেন দীপ্তিকর,
আহা কিবা মনোহর, অন্তর শীহরে লো।

---

* বোধ হয় লেখকের হস্তাক্ষর ঠিকমত পড়িতে না পারায়, 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রণকালে কবিতাটিতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১০ মার্চ ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন ( 'শনিবারের চিঠি,' ১৩৩৮, পৃ. ২৮৯-৯১ দ্রষ্টব্য )। ভুলগুলি সংশোধন করিয়া কবিতাটি প্রকাশ করা গেল।

কিন্তু দেখ হায়২, চপল চপলা প্রায়,
তারা এক খসি যায়, কি দুখের তরে লো।
বুঝেছি বুঝি লো প্রিয়ে, তব নেত্র নিরখিয়ে,
হইয়ে ব্যথিত হিয়ে, লুকালো অন্তরে লো।
কিন্তু বিপরীত হায়, গগনের তারা যায়,
দেখিয়ে পলায়ে যায়, অভিমান ভরে লো।
তায় করি দরশন, মম নেত্র তারাগণ,
অভিমানে পলায়ন, না করে না করে লো।
কিন্তু যত দেখে তায়, যত আরো, দৃঢ় চায়,
কুমুদিনী যেন পায়, পতি শশধরে লো॥
যতেক বলিল পতি, না শুনিল রসবতী,
চাহিয়ে গগন প্রতি, স্থির নেত্রে রহিল।
পল্লব নাহিক সরে, বঙ্কিমাক্ষে ভাব ভরে,
এক দৃষ্টে দৃষ্টি করে, অন্য দিক্ নহিল॥
তবে মুখ অধোকরে, অতিশয় দুঃখভরে,
কম্পাইয়ে পয়োধরে, দীর্ঘশ্বাস বহিল।
তখন নয়ন তার, উজ্জ্বল হীরকাকার,
ফেলিলেক অশ্রুধার, দুঃখে পতি কহিল॥
ওলো প্রাণ প্রেমাধার, সহে না সহে না আর,
এই বিন্দু অশ্রুধার, প্রাণে নাহি সহিল।
শুনেছি প্রবলানল, জলে করে সুশীতল,
কিন্তু তব অশ্রুজল, মোরে আরো দহিল॥
চন্দ্রমুখী কয় তায়, দেখ সখা হায় হায়,
এখনি দেখিনু যায়, গগন উপরি হে।
এই দেখি যে তারায়, প্রজ্বলিত স্বর্ণ প্রায়,
অপরূপ শোভা পায়, কত বার ধরি হে॥
মুহূর্ত্তেকে মধ্য তায়, কেহ না দেখিতে পায়,
কোথা গেল হায়২, স্থান পরিহরি হে।
কোথা তার এ সময়, মনোহর অঙ্গ রয়,
কোথা রয় করচয়, মরি মরি মরি হে॥

কিন্তু তো তাহারি সম, জীবন যৌবন মম,
তবে কেন তার তম, মিছামিছি করি হে।
যৌবন লাবণ্য নিয়ে, তোমার হইয়ে প্রিয়ে,
আজি আছি বিনাশিয়ে, কাল যাব মরি হে ॥

শ্রীব, চ, চ।
হুগলি কালেজ।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২১ জুলাই ১৮৫২ ]

## বর্ষায় মানভঞ্জন।

**রূপক।**

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

বিধুমুখি করি মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ,
হেরিতেছি অপরূপ ভাব।
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে,
রহিয়াছে সকল স্বভাব ॥
বন উপবন চয়, রসময় সমুদয়,
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব,
কেন প্রিয়ে বিরস বদন ॥
বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার,
বরষাকালেতে সব করে।
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে,
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে ॥
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে,
শোভাহীন হয়ে সদা রয়।
তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহি হবে,
সেরূপ বিরূপ অতিশয় ॥

আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর,
ঢাকি আছে দিবস যামিনী।
কেন না তোমার তরে, শশিমুখ ঢাকা রবে,
অম্বর অম্বরে বিনোদিনী॥
মান ভাঙ্গিবার তরে, ধরিলাম দুই করে,
মুখপদ্মে করপদ্ম দিলে।
বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার,
কমলিনী মুদিতা সলিলে॥
এ কালের প্রতিকূল, কাননে কোকিলকুল,
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বুঝি, তাই আছ মুখ বুজি,
মৌনবতী বরষার ডরে॥
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা,
সদাকাল নহে প্রকটিত।
তাই বুঝি জ্যোতিহারা, তোমার নয়নতারা,
অভিমানে রোয়েছে মুদিত॥
বরষায় অনুক্ষণ, বারিধারা বরিষণ,
ধারে ধারে ধরা পূর্ণ তায়।
তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেত্র নীরধর,
নীরধার ফেলিছে ধরায়॥

## নায়িকার উক্তি।

### পয়ার।

শুনিয়া শেষের শ্লেষ, কুপিল কামিনী।
বিধুমুখে মৃদুরবে, কহিল মানিনী॥
বরষার ধর্ম্ম যদি, বারি বরিষণ।
তবে কেন জলহীন, তোমার নয়ন॥
দুখিনীর দুখতাপে, হইয়া সদয়।
তোমার নয়নে কেন, বৃষ্টি নাহি হয়॥

### নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

চেও না চেও না আর, অধীনের অশ্রুধার,
এক বিন্দু নাহি প্রাণধন।
তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া খেদে,
নীরহীন করেছি নয়ন॥
নাহি আর জলধার, কোথা বল পাব ধার,
প্রেমাধার, ধার বটে ধারি।
প্রাণের সম্বল বল, তুই এক ফোঁটা জল,
যদি থাকে দিতে নাহি পারি॥
যেহেতু যখন পুন, তোমার নয়নাগুন,
করিবেক দহন আমারে।
নিবারিতে সে অনল, তখন না পেলে জল,
প্রাণান্ত হইবে একেবারে॥

পয়ার।

শুনিয়া শুনিল না, ভামিনী কামিনী।
পূর্ব্ববৎ মৌনভাবে, রহিল মানিনী॥
ঘোমটা টানিয়া দিল, মুখের উপরে।
বারিদ বসনে বিধু, আচ্ছাদন করে॥

### নায়কের পুনরুক্তি।

ত্রিপদী।

থাক থাক মানে থাক, বদনে বসন রাখ,
ঢাক ঢাক শশী ঢাক মেঘে।
দীর্ঘশ্বাস বায়ু মোর, এখনি করিয়া জোর,
জলদে উড়াবে অতি বেগে॥

পয়ার।

তবু না কহিল কথা, মানিনী রমণী।
হাসিয়া কহিছে পুন, কান্ত গুণমণি॥

ত্রিপদী।

এ কি বিপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আবির্ভাব,
সতত চপলা চমকায়।
তোমার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার,
চমক্ নাহিক হায় হায়॥

পয়ার।

দ্বিগুণ বাড়ায় মান, যত পতি সাধে।
ফলত বাহিরে সেটা, সাধে বাদ সাধে॥
পরে নিজ গাঢ় মান, জানাবার তরে।
ঘর ছেড়ে ছলেতে, বাহিরে যাত্রা করে॥
মধুভাষে বঁধু কহে, কি কর ললনা।
যেও না, যেও না, ধনি, বাহিরে যেও না॥

ত্রিপদী।

প্রণয়িনি মান পালা, ঘোর কাল মেঘমালা,
ঝালাপালা করিল আমারে।
শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও, ঘরে যাও,
দোহাই দোহাই বারে বারে॥
দুরন্ত অবোধ ঘন, ঢাকিতেছে ঘন ঘন,
গগন শোভন শশধরে।
কি জানি যদ্যপি পুন, প্রকাশিয়া নিজগুণ,
তব মুখশশী গ্রাস করে॥
তা হইলে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ,
রহিবে না শরীর পিঞ্জরে।
তাই বলি প্রাণপ্রিয়ে, বাঁচাও ঘরেতে গিয়ে,
এসো এসো ধরি দুই করে॥

পয়ার।

নিবিড় নীরদ নব, নিরখি নয়নে।
বাহিরেতে গিয়া ধনী, ভাবিতেছে মনে॥

ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী।
পলকে পলকে তায় নলকে দামিনী॥
মানে মানে মান হরি, মানিনী ভামিনী।
গরবেতে গৃহে যায়, গজেন্দ্রগামিনী॥
মানের নিগূঢ় ভাব, শেষ গেল বোঝা।
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র, হইলেন সোজা॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজ।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ১০ জানুয়ারি ১৮৫৩ ]

## হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন।

পতি।

লঘু ত্রিপদী।

রাখ রাখ প্রিয়ে, বসনে ঢাকিয়ে,
জলদ চাঁচর চয়।
দেখে জলধর, ভয়ে শশধর,
হুতাশেতে ম্লান হয়॥
আরো মোর প্রাণ, ভয়ে ম্রিয়মাণ,
দেখে নিজ প্রাণ শশী।
কুমুদিনী সতী, ম্লান প্রাণপতি,
বিষাদিত জলে পশি॥
পেয়ে মনস্তাপ, দেয় অভিশাপ,
যে সতিনী তব কোলে।
সে সতিনী তার, তাহারি প্রকার,
ডুবিয়ে মরিবে জলে॥
তাহে এই ভয়, পাছে সিদ্ধি হয়,
সে পাপ কুমুদিনীর।

সতিনী তাহার, নয়নে তোমার,
পাছে সখি বহে নীর ॥
তাই লো সুখদে, জলদ জলদে,
কর কর আচ্ছাদন।
নিশাপতি তবে, ভীত আর নবে,
শাপ হবে বিমোচন ॥

নারী।

যে ছিল তপন, খর বিলক্ষণ,
যখন শরদ দিবা।
এ যে দিনপতি, তেজে ক্ষীণ অতি,
তাহার কারণ কিবা ॥

পতি।

দ্বাদশ তপন, বিহরি গগন,
বিতরিত খর কর।
কিন্তু খসি পরে, দশ দিবাকরে,
গেল তব নখোপর ॥
এক রবি খসি, তব ভালে পশি,
সিন্দুর বিন্দুর রূপে।
দ্বাদশ দিনেশ, এক অবশেষ,
উজ্জ্বল হবে কি রূপে ॥

নারী।

কেন হে কমল, ত্যজিল কমল,
হেমন্তের আগমনে।
পাছে বা পলায়, প্রাণ পদ্ম তায়,
এ ভয় তা দরশনে ॥

পতি।

করাল মরাল, মনে জানি কাল,
কমল কমল হরি।

ভয় যুক্ত হিয়ে, রহে পলাইয়ে,
তোমারে আশ্রয় করি ॥
হেরিয়ে নখরে, পতি দিবাকরে,
তাহার নিকটে যায়।
তোমার গমন, হংস নিদর্শন,
দেখিলেক সে তথায় ॥
ভয়ে হয়ে ভীত, পলাতে চিন্তিত,
ত্রাণ স্থানে নিরুপায়।
হইয়ে অগতি, ত্যজে বসুমতী,
শেষেতে পলায়ে যায় ॥

নারী।

শরদ স্বভাব, ত্যজিল স্বভাব,
ধরিল মলিন ভাব।
অতি মনোহর, পদার্থ নিকর,
হইলেক রসাভাব ॥
বিধু ম্লান অতি, দীন দিনপতি,
নলিনী মলিনী হয়।
আর তরুদলে, ফল নাহি ফলে,
পূর্ণ পক্ক পত্রচয় ॥

পতি।

না লো প্রাণ সখি, বিটপি নিরখি,
হেমন্তে তোমায় প্রাণ।
নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত,
তুমি তরু করি জ্ঞান ॥
অধরেতে তব, নবীন পল্লব,
পল্লরিত তরু তাই।
সেই তরুফল, ও দুই শ্রীফল,
তোমাতে দেখিতে পাই ॥

নারী।

কেন কেন কান্ত, হয়েছে একান্ত,
নীরব কোকিলকুল।
কি হেতু বল না, না করে কলনা,
হিমে কেন প্রতিকূল॥

পতি।

শুন প্রাণ বলি, কোকিল কাকলী,
যেহেতু হইল হারা।
মধুস্বরে তব, হইয়ে নীরব,
তোমারে শাঁপিছে তারা॥
তব বিধুমুখ, হইবেক মূক,
যেমন তাহারা হয়।
তাই বুঝি প্রাণ, যবে কর মান,
ও মুখ নীরবে রয়॥

নারী।

কেন ফণিবর, প্রবেশি বিবর,
পাতালে গমন করে।

পতি।

বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি,
পলাইল বিষধরে॥
যদি বল ধনি, দূর হলে ফনি,
অবনী মণ্ডল হতে।
আর ধরাতল, কিছু হলাহল,
রহিবে না কোনমতে॥
তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়,
তোমার নয়নে প্রাণ।

সে গরল পারে, সংহার সংসারে,
করিবারে সমাধান ॥
কিন্তু চমৎকার, সর্প বিষাধার,
সবে ত্যজে যত্ন করি।
নয়ন গরলে, যতনে সকলে,
বাঞ্ছা করে ডুবে মরি ॥
গরল অহির, শুধু কলহির,
ইচ্ছাক্রমে হয় পান।
নয়ন গরল, প্রেমিকে কেবল,
পান করে ওরে প্রাণ ॥
কিন্তু চমৎকার, বিষনাশকার,
অমৃত বিষেরি কাছে।
কেন রে এ বিধি, নয়ন সন্নিধি,
অধরে অমৃত আছে ॥
বুঝেছি কারণ, একত্রে স্থাপন,
যেহেতু গরলামৃত।
সর্পের দংশনে, ছিল ওঝাগণে,
গরলে করিতে মৃত ॥
নয়ন গরল, করিতে বিফল,
অবনীতে কেহ নাই।
মুখ সুধাধার, নিকটে তাহার,
নাশার্থ রয়েছে তাই ॥

## নারী।

তাড়ায়ে মলয়, কাল হিমালয়,
এলো কোথা হোতে বল।
হয় অনুমান, জনমের স্থান,
সে গিরি অতি শীতল ॥

পতি।

মোর বোধ হয়, এলো হিমালয়,
কুচগিরি হোতে তোর।
কেন না সে স্থল, বড়ই শীতল,
স্নিগ্ধ কর হৃদি মোর॥

নারী।

কোথায় মলয়, এমন সময়,
রহিলেক লুকাইয়ে।
হেরি হিমালয়ে, বোধ হয় ভয়ে,
সে গেল বা পলাইয়ে॥

পতি।

হিমালয় ভয়ে, ত্রিভুবন ময়ে,
আর তার স্থান নাই।
পায় তব পাশে, আশ্রয় নিশ্বাসে,
এ সৌরভ তথা তাই॥

নারী।

কেন হে নীহার, বর্ষে অনিবার,
গগনে রজনীভাগে।
কিবা শোভা মরি, সদা ইচ্ছা করি,
রাখিব নয়ন আগে॥

পতি।

পতি শশধরে, দরশন করে,
রজনী মলিন ভাব।
বলে কেন নাথ, হেরি অকস্মাৎ,
হোলে হাস্যরসাভাব॥

করি অপরাধ, দিয়েছে বিষাদ,
বুঝি এই অভাগিনী।
কাতরে নাথেরে, এ মিনতি করে,
শেষে কাঁদে সে রজনী॥
সে রোদন ছলে, নয়নেরি জলে,
নীহার বর্ষণ করে।
এই সে কারণ, নীহার বর্ষণ,
কহে যত মূঢ় নরে॥
কিন্তু আমি বলি, সে মিথ্যা কেবলি,
সত্য যাহা আমি কই।
শশাঙ্ক গগনে, ও মুখ দর্শনে,
মলিন কাঁদিছে ওই॥
যত তারাগণে তোমার নয়নে,
কাঁদিতেছে অবিরত।
নয়নের জলে, নীহারের ছলে,
পতন করিতে রত॥

নারী।

হয়েছে শীতল, দেখিতেছি জল,
পুন শীত কি কারণ।

পতি।

বুঝি কি কারণে, কুরঙ্গ নয়নে,
কেঁদেছিলে প্রাণধন॥
সেই অশ্রুজল, বহি বক্ষস্থল,
কুচ হিমালয় শৈল।
সে গিরি পর্শনে, নয়ন জীবনে,
অতিশয় হিম হৈল॥
সেই বিন্দু জল, পড়িয়ে ভূতল,
জলে গিয়ে মিশাইল।

অশ্রু পরশনে, জল সেই ক্ষণে,
অতি শীতল হইল ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজ।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ ]

## শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন।

লঘু ললিত।

স্ত্রী। হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল, হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয় ॥
সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয়, শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল, হলো সম্প্রতি ॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায় ॥

পতি। মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খরতর,
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে ॥

স্ত্রী। কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিহরি, রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ ॥

পতি। নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে,
তখনি হেরিয়ে, তোমার মুখ।
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ॥
আছে যত ক্ষণ, শশী প্রাণধন,
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহু ক্ষণ ধরি, রয় ধরায়॥
কিন্তু লো যে ক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে, নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে॥

স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে, এ কুজ্ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকারময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা॥

পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ, শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায়॥
কিন্তু তব স্থান, হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে, সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর, নাহিক রয়॥
ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনের ধূম, ব্যাপে নভোভূম,
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয়॥

স্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান, উন্মত্ত প্রায়।

কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে, হইল দায় ॥

পতি। বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুরারি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয় ॥
হরের ইন্দুর, সমান সিন্দূর,
শিরে লো তোমার, কি শোভা পায়।
সদা শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায় ॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হরের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপর, রয় তেমতি ॥
যেইমত হরে, কণ্ঠে বিষ ধরে,
তেমতি গরল, তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর ॥
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে,
কাছে না এনে সে, নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে যে গরল ধরে,
দূর হইতেই, মানবে মারে ॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে,
মুখামৃতে বিষ, নিস্তেজ হয় ॥

স্ত্রী। কি মূঢ় মানব, কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন, তাহা না জানি ॥

পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষোপরে,
দৃষ্টি নাহি কর, কি অপরূপ।
আপনি কেমনে, আপন নয়নে,
রেখেছ অনল, কহ স্বরূপ॥

স্ত্রী। তবে প্রেমাধার. রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল॥

পতি। যদি তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল, যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর, স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত বিপক্ষ তার॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।
এমতে ধরায়, নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হতে, ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল, সলিলবাসী॥

৪ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ ]

## দূরদেশ গমনের বিদায়।

পতি

ললিত।

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবার,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি লো।

আজিকার নিশি ভোরে, লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কত দিন তোমা বিনে রহিব কি করি লো ॥
বিদরে বিদরে বুক, হেরিব না বিধুমুখ,
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি লো।
আসি কি না আসি ফিরে, হেরি কি না প্রেয়সীরে,
জানি নে জানি নে কিছু, বাঁচি কি না মরি লো ॥
হেরি কি না হেরি আর, শশিমুখে ফিরে বার,
জনমের মত তাই হেরি ভাল করি লো।
সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বুঝি লয় হরি,
বুঝি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডরি লো ॥
কি শুনি কি শুনি ধনি, কুহু কুহু করি ধ্বনি,
হৃদয়ে শিহরি মরি, যে শুনেছি কাণে রে।
বুঝেছি বুঝেছি মরি, পোহাইল বিভাবরী,
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে রে ॥
হা রজনি একবার, রহ রহ রহ আর,
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমুখী পানে রে।
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই,
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে রে ॥
একবার মরি মরি, হৃদয়ে হৃদয়ে করি,
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে।
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে,
জনমের মত কি না, কে জানে কে জানে রে ॥
না লো না লো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি,
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরিবার নয় লো।
ওই দেখ নীল নিশি, মৃদু আলো সনে মিশি,
করিছে বিঘোর আলো, চারি দিগময় লো ॥
অসীম আকাশে পশি, নাহি রবি নাহি শশী,
গগনে নিভেছে যেন, যত তারাচয় লো।
কি বলি গগনোপরে, একাকী মধুর করে,
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো ॥

এখনি আকাশোপর, প্রকাশিবে প্রভাকর,
এখনি যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয় লো।
আসি লো আসি লো প্রিয়ে, আসি লো বিদায় নিয়ে,
চলিলাম কত দূরে, কি কপালে রয় লো॥
যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়েরি পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে লো॥
তোমা চিন্তা সর্ব্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে,
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরে দেখা আশে লো।
সুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা,
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে লো॥

স্ত্রী

ত্রিপদী।

কেন অরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন রে যামিনীভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না॥
জেনেছি জেনেছি আগে, যখনি যামিনীভাগে,
হৃদি মোর হইল চঞ্চল।
তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণের জনে,
যাবে মোর যা আছে সকল॥
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে,
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল।
কেন রে অস্থির হিয়া, ক্ষণে উঠি শিহরিয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল॥
প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে,
অস্থির হৃদয় হব স্থির।
স্বর্গসুখ সম হিয়ে, তদুপরে হৃদি দিয়ে,
কত সুখে ঘুমাই গভীর॥

মরি মরি সে প্রকার, যাইতে পাব না আর,
নিদ্রা তব হৃদির উপর।
হৃদিপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরশিয়ে,
জুড়াব না কাতর অন্তর ?
সেখানে যতেক জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা,
শুধু যত সুখের স্বপন।
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার,
শশধর সমান বদন॥
নয়নে নয়ন করি, অধর অধরোপরি,
করিব না কি আর চুম্বন।
আর কি হে করে করে, মিলাব না পরস্পরে,
স্কন্ধে কর করিয়ে ধারণ॥
না হে না হে সুখকাল, হয়েছে অতীত।
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত॥
জানি২ যেই জ্বলা, অহরহ ঝালাপালা,
করিবে আমারে মনে মনে।
না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দহিবে বুক,
মানাগুনে গোপনে গোপনে॥
শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা,
সপ্রবল শয়নে স্বপনে।
আসা দিন অনুরাগী, প্রাণে রব তার লাগি,
শুধু সেই দিন আসামনে॥
যেন যবে বিভাবরী তমসা বসন পরি,
শশধর না করে প্রকাশ।
যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে,
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ॥
নিবিড় তিমিরময়, শুধু দরশন হয়,
শশী তারা নাহিক আকাশে।
শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর,
এক তারা একাকী বিকাসে॥

তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে,
গেছে যত আশা যত সুখ।
শুধু প্রাণনাথ আসা, তারি প্রাণ ভরা আশা,
একাকী বিহরে মোর বুক॥
সে সুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে,
কবে হবে ফিরে দরশন।
করি তাহে জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা,
যদি পারি ভুলিতে রতন॥

পতি

চৌপদী।

যদি দেহে প্রাণ ধরি, আসিব হে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণ মরি, রহে না লো রহে না।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেঁথেছে মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহে না লো সহে না॥
কিন্তু লো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে,
আর কথা পরস্পরে কহে না লো কহে না।
তবে যাই সুনয়নি, যাই লো হৃদয়মণি,
যাই কিন্তু পদ ধনি, বহে না লো বহে না॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৮ মার্চ ১৮৫৩ ]

রূপক।

## কামিনীর প্রতি উক্তি।

তোমাতে লো ষড় ঋতু।

পয়ার।

অপরূপ দেখ এ কি, শরীরে তোমার।
এক ঠাঁই ষড় ঋতু, করিছে বিহার॥

নিদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত।
নিরখি শিশির আর, দুরন্ত বসন্ত॥
এ সবার সেনা আদি, তোমাতে বিহরে।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদাদি, কহি পরে পরে॥

গ্রীষ্ম।

তপন সিন্দূর বিন্দু, অতি খরতর।
ক্রোধভরে করে কর, বসি মুখোপর॥
সে রবি রক্তিম রাগে, শুন হেতু তার।
নিরখিল নিজ প্রিয়া, চরণে তোমার॥
প্রফুল্লিতা কমলিনী, প্রেমভরে বসি।
নখরের ছলে কোলে, উপপতি শশী॥
নলিনী শশাঙ্ক সহ, করিতেছে বাস।
প্রভাকর করে তাই, প্রকোপ প্রকাশ॥
অতি ক্রোধযুক্ত রবি, হয়েছে এবার।
তাই লো আরক্ত ছবি, দেখিতেছি তার॥
ঠেকে শিখে দিবাকর, রমণীর রীতি।
সামলিতে অন্য নারী, ধাইল ঝটিতি॥
তোমার পঙ্কজ মুখ, প্রাণের রমণী।
আগুলিতে আগে ভাগে, আইল অমনি॥
বদন সরোজ কোলে, সিন্দূর তপন।
বিশেষ কারণ তার, বুঝেছি এখন॥
পতিরে পাইয়া কোলে, সুখে আনন্দিত।
তোমার বদন পদ্ম, হলো বিকসিত॥
প্রবল প্রভাবে ঘন, বহে সমীরণ।
তোমা হেরে দীর্ঘশ্বাস, ছাড়িছে পবন॥
যে অনল নিদাঘেতে, দহে ত্রিভুবনে।
সে অনল আছে ওই, তোমার নয়নে॥
গ্রীষ্ম ভয়ে হরি সহ, বাস করে করী।
তাহাও তোমাতে সখি, দরশন করি॥

করিয়াছে স্থিতি তব, কটিতে কেশরী।
আছে কুম্ভ জাগাইয়া, কক্ষোপরি করী॥
গ্রীষ্মে তরু সুশোভিত, ফলে অহরহ।
তুমি তরু শোভিতেছ দুই ফল সহ॥
এ সবেতে পরাভব, নিদাঘ পলায়।
আইল স্বদল সহ, বরষা তথায়॥

বর্ষা।

নিরন্তর, নীরধর, নিরখি চাঁচরে।
হাসি ছলে সৌদামিনী, নাচিছে অধরে॥
হানিছে তাহারা সদা, অশনি আমায়।
হৃদয় বিদরে তায়, জর জর কায়॥
যে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরখি।
বরযার বারিধারা, তারে বলি সখি॥
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে।
বরযায় শশী ঢাকা, যেন জলধরে॥
ধরিতে আমার কর, মুদিয়াছ করে।
কমল মুদিত যেন বরষার ডরে॥
উপরে ধরেছে কালো, তব পয়োধর।
গিরিশিরে শোভে যেন, নব পয়োধর॥
বিধুমুখি তাহে এই, বিনতি হে করি।
চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরী॥
বরযায় মনোহর, তরু শোভাকর।
দাড়িম্ব দেখি লো ধনি, তব পয়োধর॥
গিরিপরি নব লতা, শোভে এ সময়।
সে গিরি তোমার কুচ, হার লতা হয়॥
এ সবেতে পরাভব, বরষা পলায়।
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায়॥

শরদ।

শরদের সুধাকরে, সুধা করে কত।
সে ভাব নিরখি তব, মুখে অবিরত॥
কিন্তু যে কলঙ্ক কালি, থাকে শশধরে।
সে কলঙ্ক নাহি তব, মুখের ভিতরে॥
যদিও নাহিক মৃগ, আছে কিছু তার।
মৃগের নয়ন করে, বদনে বিহার॥
বসন বারিদ পুন, হইয়াছে দূর।
পুনরায় প্রকাশিত, তপন সিন্দূর॥
কর কমলিনী সদা, আছে বিকসিত।
কঙ্কণের নাদে অলি, গায় সুললিত॥
শরদে মরালকুল, সুখে কেলি করে।
তোমাতে মরাল ভাব, গমনের তরে॥
চন্দ্রিকা হয়েছে প্রিয়ে, অতি পরিষ্কার।
নিরখি তাহার আভা, বরণে তোমার॥
প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, চন্দ্রমনোহরা।
হেরি তব নয়নেতে, বিষামৃতভরা॥
যদি বল চন্দ্রকোলে, আছে কুমুদিনী।
দূর ঘুচে একত্রিত, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
তার হেতু ইন্দীবর, তোমার নয়নে।
শরণ লয়েছে গিয়ে, পতি নিকেতনে॥
এ সবেতে পরাভব, শরদ পলায়।
আইল স্বদল সহ, হেমন্ত তথায়॥

হেমন্ত।

… … … … [ অস্পষ্ট ]
কখনো সদয় হও, কভু মান কর॥
নিদাঘ, শরদ, বর্ষা, এই ঋতুচয়।
বিশেষ বসন্ত কাল, হয় রসময়॥

এই হেতু ধনি এই, ষড় ঋতুগণ।
তোমার সরস ভাব, করিছে বর্ণন ॥
কিন্তু তাহে বর্ণিত, না হবে, তব মান।
সে মান বর্ণিতে আমি, হই ম্রিয়মাণ ॥
এ কথা যদ্যপি তুমি, কহ সুলোচনা।
হেমন্ত, শিশির ছলে, মানের রচনা ॥
ফলত ঘটিল তাই, আমার কপালে।
মান করি নিজ দেহে, হিম দেখাইলে ॥
বিরস হয়েছে তব, মুখ সুধাকর।
মুদিত হয়েছে দেখি, আঁখি ইন্দীবর ॥
এখন কমল কর, নহে বিকসিত।
সিন্দূর রবির ছবি, নহে প্রভান্বিত ॥
নীহার নয়ননীর, নিরবধি বহে।
যে জল শীতল অতি, সে আমারে দহে ॥
শীতের স্বভাবে বারি, হয়েছে শীতল।
কিন্তু তব অশ্রুরূপে, দহে মোরে জল ॥
শীতের প্রতাপে বহ্নি, তাপহীন হয়।
মানে তাই জ্যোতিহীন, তব নেত্রদ্বয় ॥
এ সবেতে পরাভব, হেমন্ত পলায়।
আইল স্বদল সহ, শিশির তথায় ॥

শিশির।

নয়নের দীপ্তিহর, ঘন ঘোরতর।
কুআশায় ঢাকিয়াছে, রবি শশধর ॥
ঘোমটা কুআশা ঘোর, করি দরশন।
মুখ শশী, ভালে রবি, করে আচ্ছাদন ॥
থর থর কলেবর, শীতে যে প্রকার।
সেরূপ কাঁপিছে দেহ, পরশে তোমার ॥
হইতেছে রোমাঞ্চিত, বিকল শরীর।
উহু উহু, ভীম-হিম, করিছে অস্থির ॥

যেমন শিশিরে, কালো, স্নিগ্ধ হয় জল।
তেমনি তোমার অঙ্গ, কালো, সুশীতল ॥
জল হতে উঠে ধূম, অনল সমান।
তোমার নিশ্বাসে ধূম, যদি কর মান ॥
এ সবেতে পরাভব, শিশির পলায়।
আইল স্বদল সহ, বসন্ত তথায় ॥

বসন্ত।

সরস বসন্ত করে, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, করিছ তেমন ॥
সুচারু বিমল শশী, তোমার বদন।
ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন ॥
কমলে কমল কত, কমল কাননে।
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে ॥
প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব।
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব ॥
ভ্রমর ভ্রমণ করে, শুনি গুণ গুণ।
বুঝেছি নূপুর তব, করে রুণ রুণ ॥
কিবা কুহু কুহু করে, কোকিলকলাপ।
বুঝেছি সে রব তব, মধুর আলাপ ॥
তোমার সুগন্ধযুক্ত, কমল বদন।
তাহা হতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন ॥
মুখের সৌরভ লয়ে, আসিছে নিশ্বাস।
না বুঝে কহিছে লোক, দক্ষিণ বাতাস ॥
বসন্ত বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব।
তাহার প্রমাণ দেখি, অধরেতে তব ॥
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরধনুশর।
তা হেরি কটাক্ষে তব, ভ্রূযুগ উপর ॥
কিন্তু প্রাণ তব স্থানে, নিজে নাই স্মর।
কেবল রয়েছে তার, ধনু আর শর ॥

বুঝেছি কারণ সখি, যাহে নাহি স্মর।
পলায়েছে মনসিজ, হেরে কুচ হর॥
শক্ত নহে শিব সহ, করিবারে রণ।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন॥
দেখ দেখ বিধুমুখি, ঈশ্বর কৌশল।
স্থাপিত করেছে ঋতু, তোমাতে সকল॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ৩০ মার্চ ১৮৫৩ ]

## চন্দ্রদূত।

রূপক।

ত্রিপদী।

দ্বিযাম যামিনী যায়, আ মরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্ম্মল নদীতীরে।
নিরমল নীলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ,
মাঝে হেরি মধুর শশীরে॥
যেন কোন নব বালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মলিনতা মধুর বদনে।
গগন গহন বনে, মনোদুখে মরি মনে,
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে॥
সেইরূপ মনোহর, রূপ ধরি শশধর,
আলো করে ধরণী আকাশ।
গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা,
অল্প তারা আকাশে প্রকাশ॥
মাঝে মাঝে শশধরে, ঢাকে ক্ষীণ জলধরে,
মরি যেন নাথ দরশনে।

রহি গুরুজন মাঝে, মোহিনী মহিলা লাজে,
ঢাকা দেয় বদন বসনে॥
চন্দ্রিকা বসন পরা, গভীর নিশীথে ধরা,
মোহ মন্ত্রে যেন নিদ্রা যায়।
ঘোর স্তব্ধ ত্রিভুবন, দেখিয়া চাহিছে মন,
আরাধিতে অচিন্ত্য স্রষ্টায়॥
শুধু হয় শব্দ তায়, পরশি নিকুঞ্জ গায়,
চলিছে সমীর মৃদু স্বরে।
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে,
মধুর মলয় মন্দ করে॥
আহা মরি মরি কি রে, এমন নদীর তীরে,
কে রে শত শোভা ধরি বসি।
বুঝি এ বিরহ লাগি, প্রণয়িনী অনুরাগী,
যুবক জনেক যেন শশী॥
তৃণের কুসুম কুঞ্জ, ললিত লতিকা পুঞ্জ,
ঘেরি তারে বারি ধারে রয়।
যেমন মলিন শশী, মলিন বদনে বসি,
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয়॥
আঁখি হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে,
তাহাতে কতই শোভা ধরে।
যেন সে নয়ন জলে, শশী পশি ছায়া ছলে,
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে॥
নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।
আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
পার যেতে ত্রিভুবন ময়॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে।
যার তরে আশা পথে, আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পরাণ গিয়াছে॥

পয়ার।

কিন্তু রে কি হেরি তোর, হৃদয় মাঝায়।
কি রে সে কালির রেখা, লেখা দেখা যায়॥
বুঝি মম মনোরমা, ভাবিয়া আমায়।
আসিবার কথা লিখে, দেছে তোর গায়॥
না রে আর কেন মজি, মিছার স্বপনে।
জানি ভাল ভাবে না সে অনুগত জনে॥

ত্রিপদী।

বুঝি মোর দুখে দুখী, নাহি দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেছ রোদন।
হৃদয়েরি রেখাচয়, আঁখিধারা চিহ্ন রয়,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন॥
বুঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে,
তারারূপ সহস্র নয়নে।
নীহার নয়নধারা, ফেলিছে যতেক তারা,
শত শত বিন্দু বরিষণে॥
তাই বলি নিশাপতি, রতনে যতনে অতি,
ঝটিতি কর হে দরশন।
এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হিয়ে,
তার লাগি মলো একজন॥

পয়ার।

শশি হে বসিয়ে আর, বিলম্ব না কর।
এমন অচল কেন, রও শশধর॥
বুঝেছি বুঝি হে তব, যেই ভাব মনে।
যে কারণে যেতে নার, নারী নিকেতনে॥
মোহিনীর মুখ রূপ, করি দরশন।
কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন॥
তত আর নাহি দুখ, তার অদর্শনে।
সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে॥

সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি।
যাবে না যামিনীনাথ, যথায় যুবতী॥
ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি।
আদি অন্ত জানি আমি, বলিব এখনি॥

চৌপদী।

ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ,
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে।
এই কথা মূঢ়ে কয়, তাই অমানিশা হয়,
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মরিয়া রে॥
মহিলার মুখাকারে, অভিমানে আপনারে,
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে।
মহেশ ললাট স্থলে, ধিকি ধিকি বহ্নি জ্বলে,
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হরিয়া রে॥
বিমল বারিধি জলে, ডুবেছিলে কেহ বলে,
মূঢ়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে।
ভয় এই পাছে তায়, কামিনী তথায় যায়,
ছিলে কম্পমান কায়, সলিলে লভিয়া রে॥
পরেতে জানিয়া ভাল, করিছে বিরহ কাল,
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে।
ফিরে এলে সিন্ধু হতে, বলে নর শতে শতে,
যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে॥
বিধু মুখ মহিলার, দেখ নাহি ফিরে বার,
নাহি দেখি শোভা তার, আজো না পলাইলে।
যেতে বলি যত বার, তত কর অস্বীকার,
বুঝেছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে॥

পয়ার।

নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন।
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ॥

প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরন্তর।
তোমার সদৃশ আছে, দশ শশধর॥
বিশেষত পদে যদি, না পড় প্রথমে।
মুখের সম্মুখে কথা, কহ যদি তমে॥
তখনি ঘটিবে কুহূ, যেন নিশাকর।
ললনাললাটে আছে, সিন্দূর ভাস্কর॥

ত্রিপদী।

তাহে যদি বল তবে, কেন দিনপতি রবে,
ললনার ললাট উপর।
প্রেয়সীর পদদ্বয়, সদা কিবা শোভা হয়,
যুগল কমল মনোহর॥
নখর নিকর তায়, শশী সম শোভা পায়,
কমলের কোলে শশধর।
ক্রোধে রক্ত দিবাপতি, জানিল অসতী অতি,
পদরূপা নলিনী নিকর॥
ঠেকে শিখে নারী রীতে, আর পদ্ম আগুলিতে,
বদন কমল কামিনীর।
সিন্দূরবিন্দুর রূপ, নারীমুখে অপরূপ,
দিনেশ বসিল হয়ে স্থির॥
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে তুমি হে তারে,
দেখ নাই আগে তো সে জনে।
জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার,
তারে তবে চিনিবে নয়নে॥

চৌপদী।

যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর,
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে।
প্রাণের প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে,
ধরিব পরাণ আশে, বধিও না তাও রে॥

নহে রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে,
যেও না হে অস্তাচলে, এই ভিক্ষা দাও রে।
মোহিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে,
বাঁধিয়া বাঁচাব মোরে, যেও না কোথাও রে॥
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি,
অধরে অধরে ধনী, ধরিল আমায় রে।
সেকি এই নদীতীরে, এই সে নিকুঞ্জ কি রে,
তোরি তরে কলঙ্কী রে, দেখেছি কি তায় রে॥
হা নিকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর,
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে।
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার,
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে॥
ফিরে দরশন করি, তটিনীর তটোপরি,
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে।
কি শুনি কি শুনি মরি, মোহন স্বরেতে করি,
কে রে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে॥
বুঝি মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মরি,
রাখি গে হৃদয়োপরি, আঁখি আঁখি করি রে।
না রে মিছা কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বার,
মজি সুখে মিছা কার, যাতনায় মরি রে॥
নাহিক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার,
এত আশা অভাগার, সম্বরি সম্বরি রে।
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার,
শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পাসরি রে॥
যদিও জানি রে মনে, পাইব না প্রিয়জনে,
গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধরি রে।
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে,
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে॥
দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি,
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে।

কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে,
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৮ এপ্রিল ১৮৫৩ ]

## বসন্তের নিকট বিদায়।

ত্রিপদী।

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর,
হা রে হৃদি বিচঞ্চলকর।
লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার,
এ মহীমণ্ডল মনোহর॥
আর কিছু দিন ওরে, রহ রে ধরণীপরে,
বিদায় তোমারে নারি দিতে।
জানি জানি মরি মরি, এ পাপ পৃথিবীপরি,
নার আর দিনেক রহিতে॥
যতেক তোমার শোভা, মোহকর মনোলোভা,
উড়ে যায় নহে স্থিরতর।
খর দিনকরকরে, ক্রমেতে মলিন করে,
মোহকর সে শোভা নিকর॥
তাপিত কুসুম ফুলে, মাথা তুলে দুলে দুলে,
মৃদু রবে মরুতেরে কয়।
"পাপ তাপে দহে দেহ, বসন্ত আনিয়া দেহ,
মরি সে কি ফিরিবার নয়॥"
না কুসুম সুন্দরী রে, আসিবে আসিবে ফিরে,
সাধের বসন্ত মনোহর।
কিন্তু সে আসিলে ফের, তোরা তো পাবি নে টের,
আজি যাবে পড়িয়া ভূপর॥
আ মরি অমনি দুখে, বিদরে আমার বুকে,
এ অসার সংসারে রহিয়ে।

ফুলের বসন্ত মত, আশার যতন যত,
যে সকল সুখের লাগিয়ে ॥
আশা মোর সে বসন্ত, বুঝি আমি হলে অন্ত,
তবে আসি হবে রে ঘটনা।
প্রখর দুখের রবি, চিরদিন বুঝি রবি,
অভাগারে দিবারে যন্ত্রণা ॥
মরি আরে কেন আর, কেঁদে মরি এ প্রকার,
মানবেরি এমন কপাল।
ইহ লোকে চির দীন, হৃদি রবে সুখহীন,
মনোদুখে কাটাইবে কাল ॥
পরিণামে নিত্য নামে, পাবে সেই নিত্য ধামে,
নিত্যই বসন্ত বিকসিত।
যাই তথা যাই তূর্ণ, পরম প্রণয় পূর্ণ,
পরমেশে প্রেমে করি প্রীত ॥
কি ছার মিছার আর, মুখাম্বুজ মহিলার,
মোহভরে করি নিরীক্ষণ।
তেমতি মোহিত মতি, সে প্রীতি প্রকৃতি প্রতি,
রাখিবেক করিয়া যতন ॥
হা মলয় কেন তুমি, উন্মাদের প্রায়।
বেগভরে যাও দ্রুত, যথায় তথায় ॥
প্রাণের প্রণয়েশ্বরী, কুসুমের কুলে।
নাহিক নিরখি নেত্রে, জ্ঞান গেছ ভুলে ॥
না রে চল ধীরে ধীরে, আসিবে বসন্ত ফিরে,
ফিরে আসি ফুটাইবে ফুল।
ফিরে ফুটাইলে ফুলে, লইও সৌরভ তুলে,
চুম্বিয়া সে কুসুমের কুল ॥
কিন্তু রে কভু কি আর, আছে আশা ফিরিবার,
মানবের যৌবন বসন্ত।
ফুটায়ে প্রণয় ফুলে, মানবেরে দিবে তুলে,
সুখরূপী সৌরভ অনন্ত ॥

না রে সে কখনো আর, নহেকো রে ফিরিবার,
গেলে কাল আর নাহি ফেরে।
কেবলি চলিবে কাল, য দিন না ধরে কাল,
ছাড়ায়ে মায়ার যত ফেরে॥
আসিবে সে দিন যবে, কি সুখ দিবারে রবে,
যৌবন যুবতী প্রেম সুখ।
শুধু তারা দেবে জ্বালা, মন হবে ঝালাপালা,
ভাবিয়া পাপের যত দুখ॥
তাই বলি পরিণামে, অধরেতে ধরি নামে,
ঈশ্বরে অন্তরে ভাবে যেই।
পরমেশ প্রেমাস্পদ, লাভ করি মোক্ষপদ,
নিত্যই বসন্ত পাবে সেই॥

হুগলি কালেজ।
৩০ চৈত্র ১২৫৯।
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৭ মে ১৮৫৩ ]

## বিচিত্র নাটক।

( তিন মিত্রের কথোপকথন। )

**প্রথম মিত্র।**

কি বিষাদে মুখখানি, হাসি-ভরা নাই।
বেণা-বনে বসে কেন, উঠ উঠ ভাই॥

**দ্বিতীয় মিত্র।**

দেখিয়া দেশের গতি, কেঁদে মরি মনে।
সে দুখে বসিয়া আছি, বিরস বদনে॥

**তৃতীয় মিত্র।**

সখা রে বচন ধর, মিছা দুখ পরিহর,
নিজ সুখে সুখী হও ভাই।

দ্বিতীয় মিত্র।

নিজ সুখ এ সংসারে, বন বন বল কারে,
আমি তো সে সুখ দেখি নাই ॥

তৃতীয় মিত্র।

না জেনে কহিছ ভাই, সংসারে সে সুখ নাই,
জান না তো কার কাছে পাবে।
রাখ রে মানস পুরী, প্রমদার প্রেমে পুরি,
কত সুখে তোমারে মজাবে॥
পদে পদে প্রেম পথে, মজাইবে মনোরথে,
মহিলার মোহন বদনে।
মোহ মন্ত্রে রবে বাঁধা, মানিবে না কোন বাধা,
কত সুখে রবে মনে মনে ॥

প্রথম মিত্র।

এ কথাটি ভাল বটে, রটে ধরাময়।
পরম পুলকপ্রদ, প্রমদা প্রণয় ॥
বিশেষতঃ কত তাহে, ধর্ম্মের সঞ্চার।
বিবাহ বিশেষ তাই, বিধি বিধাতার ॥
নর নারী উভয়েতে, হইয়া মিলিত।
আরাধনে করিবেক, পরমেশ প্রীত ॥

দ্বিতীয় মিত্র।

ছিছি ছিছি কেন ছার, মুখাম্বুজে মহিলার,
মরিয়াছ মোহিত হইয়া।
জানি জানি যত জ্বালা, দেয় প্রণয়িনী বালা,
হারিয়াছি বারেক ঠেকিয়া॥
সবে তার এক দিন, হই আমি প্রেমাধীন,
নাকে কাণে খৎ দি হে তায়।

আদরে ভাঙ্গাতে মান, হইয়াছি অপমান,
না ভাঙ্গিল আমার কথায় ॥

প্রথম মিত্র।

সব তার সহিলাম, কত কথা কহিলাম,
মধুর মিনতি কত করি।
রামায়ণ আদি নিয়া, সব কথা কাটাইয়া,
তবু মানে রহিলা সুন্দরী ॥
সামান্য রতন নহে, রমণী রূপসী।
তার না ভাঙ্গিবে মান, বেণা-বনে বসি ॥
তাই বলি উঠ ভাই, পরিহরি দুখ।
বল তুমি বল কারে, পৃথিবীর সুখ ॥

দ্বিতীয় মিত্র।

অনিত্য সকল সুখ, নিত্য কারে বলি।
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি ॥
পৃথিবীতে আছে সুখ, কেবলি স্বপনে।
স্বপ্ন বিনে আর সুখ, নাহি জানি মনে ॥
স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল।
স্বপনে নারীর দেখি, লপন কমল ॥
ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা।
শশিমুখী সরস্বতী, আর কত জনা ॥

তৃতীয় মিত্র।

সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার।
শ্রবণে প্রবেশ করে, শত সুধাধার ॥
কবি দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে।
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে ॥
মধুর সরল ভাষে, মুগ্ধ কর মন।
করুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন ॥

বিশেষ রসিক তুমি, জানি ইহাতেই।
স্বপ্ন দরশনে দেখ, সতীত্ব নিজেই ॥

প্রথম মিত্র।

এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ।
এস মিত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ ॥

তৃতীয় মিত্র।

স্বপনে আমার ভাই, মন নাহি ভজে।
আসল পাইলে বল, নকলে কে মজে ॥
বিশেষ একেতে আমি, ডরি হে কতক।
একেবারে তাড়াব না, দেশের র*ক ॥

প্রথম মিত্র।

ওই দোষে চিরকাল, মরিলি রে তুই।
ভাল কথা তোর মুখে, শুনি নে কভুই ॥

তৃতীয় মিত্র।

তুমিও তো ওই রসে, মজিয়াছ ভাই।
সে কথা শুনেছি ভাল, কামিনীর ঠাঁই ॥
চতুর জামাই হও, শ্বশুরের ঘরে।
ফুল খেলা কত জান, বাগান ভিতরে ॥
কিন্তু আহা মরি মরি, কামিনীর রূপ।
কি মোহন মন্ত্র দিয়ে, বর্ণেছ স্বরূপ ॥
মধুর মোহন ভাষে, মোহিনী বর্ণন।
বুঝি হে কখনো আর, ভুলিবে না মন ॥

এই সময়ে শ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গুপ্ত নামক কয়েক জন পুলিস সংক্রান্ত শস্ত্রধারী আসিয়া কহিল যে

চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর।
পরধন কর চুরি, এত সাধ্য তোর ॥

তৃতীয় মিত্র।

বাহারে ! এ যে হে বড়, বাহারে চাতুরী।
বল দেখি কার কিবা, করিয়াছি চুরি॥

গুপ্ত।

কার কি করেছ চুরি, এ তো নাহি জানি।

বিশ্বদাস।

বলেছে তোমারে চোর, শুধু অনুমানি॥

তৃতীয় মিত্র।

ভাল ভাল এত বুদ্ধি, প্রশংসার বটে।
না জানিয়া চোর বলা, সুবুদ্ধিতে ঘটে॥

শ্যামাচন্দ্র।

না জানিয়া তোরে কভু, চোর বলি নাই।
তাহার কারণ তবে, শুন মোর ঠাঁই॥
সে কালের কালী বাবু, বড় ধনবান।
পরেছিল ছ-পাড়ের, ধুতি একখান॥
তুমিও তো ছ-পাড়ের, ধুতি পরিয়াছ।
তাই বলি তার ধুতি, চুরি করিয়াছ॥

তৃতীয় মিত্র।

বটে বটে দিব্য আছে, এই পৃথিবীতে।
দুখানি ছ-পেড়ে ধুতি, নারিবে জন্মিতে॥

শ্যামাচন্দ্র।

চোপ্ চোপ্ চোপ্ রহ, মৎ কর সোর।
পুলিসের মাজিষ্ট্রেটি, পদ আছে মোর॥
আমি বলিতেছি তুই, চুরি করেছিস্।
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্মিস্॥

তৃতীয় মিত্র।

যো হুকুম্ খোদা-বন্দ, হইল ইয়াদ্।
বল দেখি কত দিন, খাটিব মিয়াদ॥

গুপ্ত।

মানিলাম নাহি তুমি, করিয়াছ চুরি।
তবু দোষ দেখাইতে, পারি ভূরি ভূরি॥

প্রথম মিত্র।

কেবলি দেখায়ে দোষ, কি লাভ তোমার।

গুপ্ত।

দোষ দেখানো হে বাপু, ব্যবসা আমার॥
তোমারো সহস্র দোষ দেখাইতে পারি।
বিশ্বদাস তাহে মোর, আছে সহকারী॥

প্রথম মিত্র।

ভাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার।
অসার সংসারে শুধু, তুমি প্রশংসার॥

গুপ্ত।

গুপ্ত রাখিলাম বাপু, নামটি আমার।
গু আছে প্রথমে তার মধ্যেতে পকার॥

তিন জন পুলিস প্রহরী।

কথার গতিক বড়, উত্তম না ঘটে।
স্বস্থানে প্রস্থান করা, যুক্তি মত বটে॥

ইঁহারা প্রস্থান করুন।

তৃতীয় মিত্র।

সময় হতেছে নাশ, যাই নিজ নিজ বাস,
কি করিব ভেবে দেখি মনে।

তুমি যাও এই বেলা, কর গিয়া ফুল খেলা,
যামিনীতে কামিনীর সনে ॥
তুমি ত্যজিবে না বনে, ভাব গিয়ে নিজ মনে,
আজিকে দেখিবে কি স্বপন।
আমি বাড়ী গিয়ে ভাই, মনসুখে নিদ্রা যাই,
স্বপন কি, না জানি কখন ॥
তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই,
এই আশা করে মোর মন।
যদি কোন কথা মোর, হয়ে থাকে অতি জোর,
then beg you pardon.

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ ]

## বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ।

কামিনী।

ত্রিপদী।

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর,
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নব নীল নিরুপম, অর্দ্ধ তমস্বিনী সম,
জ্বলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে ॥
ঘন ঘোর গরজনে, বিদারে গগনে বনে,
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ,
গরজন বরিষণ হয় ॥

পতি

প্রাণেশ্বরি শুন শুন, যে কারণে পুন পুন,
গরজন বরিষণ হয়।

অতিশয় দম্ভভরে, বর্ষা আগমন করে,
সঙ্গে সব সহচর হয় ॥
ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভুবনের মাঝ,
রূপবান তাহার সমান।
সে গর্ব্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ,
বরষার পূর্ণ অপমান ॥
নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব,
রূপেতে কিরূপে তোমা সমা।
তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে,
দুখিনী দামিনী নিরুপমা ॥
মরি কি সুন্দর পশি, মুদিতা সুন্দরাবসি,
কোমল কমল কলি জলে।
তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে,
নব কুচ কলিকা যুগলে ॥
বর্ষার পল্লব নব, তাহাতে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।
নদ নদী জলে টলে, তাহাতে যৌবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা ॥
আরো দেখ করিবরে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে,
চীৎকার করিছে কুঞ্জর ॥
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্ব্বের সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকাঢাকি, কেশেতে সিন্দূর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ ॥
পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে,
কত অপমান বরষার।
এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার ॥

সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টিধার তার,
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জে অনিবারে ॥

কামিনী

বিঘোর নীরদোপরে, কত হাব ভাব ভরে,
চপলা চঞ্চলা চমকায়।
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা,
ক্ষণ পরে বারিদে লুকায় ॥

পতি

গিরির শিখরপরে, থাকে যত জলধরে,
দেখিল তোমার কুচগিরি।
পরিহরি সে ভূধরে, রৈতে পয়োধরপরে,
আসিতে লাগিল ধীরি ধীরি ॥
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়,
বসিয়াছে মনের পুলকে।
ক্রুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে, অগ্নিশিখে উঠে চক্ষে,
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে ॥
জলধর ক্রোধমনে, আদেশিল সমীরণে,
উড়াইতে বুকের বসন।
তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে,
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ ॥

কামিনী

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর,
নিরমল গগনমণ্ডলে।
এমন কেন গো শশী, গগনমণ্ডলে পশি,
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে ॥

পতি

তোমার সমান হতে, শশধর বিধিমতে,
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া।
দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান,
মুখ মেঘবসনে ঢাকিয়া॥
বৃষ্টিধারে ধীরে ধীরে, ফেলিয়া অশ্রুর নীরে,
ম্লানমুখে করিয়াছে মান।
হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান॥

কামিনী

খর কর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি,
নহে প্রকাশিত প্রভাকর।
না হেরি পতির মুখে, নয়ন মুদিয়া দুখে,
কমলিনী কতই কাতর॥
সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরুষময়,
কি কঠিন তাদের হৃদয়।
এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর,
রমণীরে কেমন নির্দ্দয়॥
কমলিনী যার তরে, সতত বিলাপ করে,
মৌনমুখী মুদিত নয়ন।
দয়া করি সেও তায়, ফিরিয়া নাহিক চায়,
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন॥

পতি

গুণমণি দিনমণি, কেন লো রমণীমণি,
না বুঝিয়ে দোষ দিবাকরে।
নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ,
তার সনে দেখা নাহি করে॥

তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিনী,
সিন্দূরের বিন্দু প্রভাকর।
কোলে অন্য দিবাকর, কমলিনী কলেবর,
দেখিয়ে ম্লান দিনেশ ঈশ্বর ॥
মনে জানিলেন দড়, নলিনী অসতী বড়,
নাহি করে মুখ দরশন।
গুণমণি, দিনমণি, কেন লো রমণীমণি,
না জানিয়া দোষ লো তপন ॥

কামিনী

এ সময় মধুকরে, কি জ্বালায় জ্বলে মরে,
মুদিত সকল শতদল।
যদি কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্ল দেখে তায়,
মধুহীন যতন বিফল ॥
ভ্রমে ভ্রমি সে ভ্রমরে, যদ্যপি গমন করে,
অন্য কমলিনী নিকেতন।
মৃণাল কণ্টকে লেগে, ছিন্ন অঙ্গ হয়ে রেগে,
অন্য পদ্মে করিল গমন ॥
অপ্রকাশ্য সেই কলি, বাতাস লাগিল বলি,
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে।
নিরুপায় নিরাশায়, শেষে মধুকর যায়,
কলিকা উপরে স্থান লতে ॥

পতি

আ মরি লো এ অধীনে, সেই মত এক দিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।
তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন ॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মুখ শতদল।

গিয়ে তায় মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল ॥
তাহাতে বঞ্চিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।
গহনা মৃণালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,
পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥
হেলে দুলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে,
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা হৃদিপরে,
দূরে গেল মানের ছলনা ॥

কামিনী

বল বল তারাচয়, কেন কেন ম্লান হয়,
ছিল কিবা শোভাকর কর।

পতি

যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনীপতি,
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥
পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই,
আকাশের দীপ তারাগণে।
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর,
উঁকি মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥

কামিনী

পেয়ে নীরধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নীর,
আহা মরি শোভা তার কত।
জলপূর্ণ সরোবর, যদ্যপি হে মোহকর,
কমলিনী বিনে শোভা হত ॥

পতি

না লো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর,
সরোজিনী সহ শোভা পায়।

ধরণী সলিলাবৃতা, যেন সরো সুশোভিতা,
তুমি প্রাণ কমলিনী তায়॥

কামিনী

এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা,
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ।
কমে গেছে তমস্বিনী, তবু তাহে বিষাদিনী,
বিরহিণী বিনোদিনীগণ॥

পতি

সুমেরু শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার,
এ তিন শিখর নিরখিয়া।
হইল তপন ব্যস্ত, কোন্‌টায় যাবে অস্ত,
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া॥
ঘন ঘোর ঘন অতি, ঢেকেছে যামিনীপতি,
বিরহিণী বিষাদে রজনী।
কেঁদে কেঁদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি,
যৌবনেই মরে গেল ধনী॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজীয় ছাত্র।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ ]

কালেজীয় কবিতার মারামারি*

**বিষম "বিচিত্র নাটক"।**

অর্থাৎ

কবিদের মজ্‌লিস এবং ঐ নাটক দর্শন।

দলমল ঝলমল, শত দীপ সচঞ্চল,
নিশাযোগে অট্টালিকা মাঝে।

* শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।

সে আলোর কিবা নিভা, চন্দ্রিকার দিবা বিভা,
যেন তথা মিশিয়ে বিরাজে ॥
কোটী দীপ কাঁচ মাঝে, কোটী তারা সুবিরাজে,
জ্বলে যেন হিরাময় বাসে।
কতই কুসুম তায়, ঝলমল শোভা পায়,
প্রভাময় সকলি প্রকাশে ॥
ঝক্‌মক্ ঝলমল, আলো মাঝে সচঞ্চল,
নৃত্যকীর বসন ভূষণ।
ঝকমোকে বেশ ধরি, বসেছে বিরাজ করি,
কবীশ্বর পাশে কবিগণ ॥
ধীরে ধীরে বীণা বাজে, ধীরে ধীরে নিশি মাঝে,
মৃদু মৃদু গায় বামাস্বরে।
বিদ্যা আর অবিদ্যার, নৃত্য হবে দুজনার,
কে ছোট কে বড় জানিবারে ॥

বিদ্যার নাচ।

নাচে শশিমুখী, গজেশ গতি।
ললনা ললিতা, লাবণ্যবতী ॥
কোমল কুসুম, কলিকা প্রায়।
কনক ভূষণ, কনক কায় ॥
নিবিড় নিতম্ব, যৌবন ভার।
হাব ভাব হেলা, কত প্রকার ॥
হেলিয়ে দুলিয়ে, নাচিছে ঘুরে।
ভূষা ঝলমল, কুসুম ঝুরে ॥
প্রেমময় নীল, কোমল আঁখি।
স্থির রাখিয়াছে, ধরায় রাখি ॥
বঙ্কিম নয়নে, বারেক চায়।
বিদ্যুৎ সমান, তখনি যায় ॥
ঝাপ্টার মাঝে, বদন চাঁদ।
আশে পাশে ফেরে, রসন ফাঁদ ॥

হাব ভাব কত লাবণ্যে মাখা।
কেমন নাচিছে, কেমন বাঁকা॥
ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ফিরিয়ে ফেরে।
চলিয়ে চলিয়ে, চলিয়ে ধীরে॥
কখন কি রূপে, কোথায় আছে।
সমীরে সরোজী, যেমন নাচে॥
কি রূপ কি ভাব, কেমন ছবি।
দেখে গেল গলে, যতেক কবি॥
যন্ত্রমুগ্ধ সবে, অচল আঁখি।
বিদ্যা চলে গেল, তাদের রাখি॥

অবিদ্যার নাচ।

আইল অবিদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বুক।
ঢেঙ্গা মাগী পেট্‌মোটা, হাঁড়িপানা মুখ॥
বরণে হাঁড়ির তলা, ঝক্ মেরে যায়।
দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাঁত, সাঁচি পান খায়॥
বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়।
তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায়॥
ধূপ্ ধাপ্ করে নাচে, মেঝে করে চুর।
পাঁকেতে নাফান যেন, ব্যাঙ্গ বাহাদুর॥
কবিগণ হেসে মরে, বলে এ কি পাপ।
পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্ বাপ্ বাপ্॥

অবিদ্যার প্রতি কবিদের
রহস্যোক্তি।

অবিদ্যা এতেক বিদ্যা, শিখিল কোথায়।
মোহিত হইয়া মোরা, জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পরিচয় দাও ধনি, কেন এত বিদ্যা।
আ মরি সুন্দরি তুমি, কাহার অবিদ্যা॥

অবিদ্যা।

"প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন।
সসাগরা ধরা নিজে, করিল শাসন॥
তাঁহার সখের মোরা, দুই পাটরাণী।
প্রথমা অবিদ্যা আমি, দ্বিতীয় দুর্ব্বাণী॥"
পুত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বেঁচেছি।
কিন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচেছি॥

কবিগণ।

এমন সুন্দর নাচ, কভু দেখি নাই।
তাই এক অভিলাষ, করেছি সবাই॥
সুখী হব পুত্র তব, দেখিবারে পেলে।
কে জানে সে কতগুলি, তোমার তো ছেলে॥

কুবিদ্যা।*

ছেলের গুণের কথা, কি কহিব আর।
রূপেতে আমারি মত, বাছা বাঁচা ভার॥
ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে অধিকারি।
নাচিতে গাহিতে বাছা, স্বরূপ আমারি॥
কিন্তু আজ পারে কি না, নাহি যায় বলা।
কেবল ঝক্‌ড়া করে, ভাঙ্গিয়াছে গলা॥
সতিনী পালিত পুত্র, আছে এক ছোঁড়া।
সেই কালোমুকো হলো, ঝক্‌ড়ার গোড়া॥
এক দিন তারে দেখে, আমার তনয়।
মাই ধ'রে কোলে বসে, মৃদু মৃদু কয়॥
"ওমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন।
রাজভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন॥

---

* কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম বিবেচনা করিতে হইবে, অবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে জানা যাইবে।

আমি কহিলাম উহা, বলো না রে আর।
ও পোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার॥
সব কথা শুনিতে না, পেয়ে কবি ভালো।
মনে২ কাল অর্থে করিলেন কালো॥"
হইল বিষম মনে, অভিমান বোধ।
বারে বারে কটু বোলে, দেয় প্রতিশোধ॥
তাই তারে গালি দিল, কুমার আমার।
সে দ্বন্দ্বে মেরেছে হুড়ো, বুঝি কাকে আর॥
দুজনের সনে দ্বন্দ্ব, এ আর কেমন।
একা গাই দুই ষাঁড়, সে জ্বালা যেমন॥

কবি ঈশ্বর।

সে তোমার পুত্র নয়, ভাল জানি আমি।
তা হইলে হবে কেন, বিদ্যাপথগামী॥
বিদ্যালয়ে থাকে ছেলে, বিদ্যা অনুরাগী।
তোর ছেলে হবে কেন, দূর বুড়ো মাগী॥

কুবিদ্যা।

তুই চুপ্ কর্ মেনে, সে ছেলে আমার।
তাই পরিচয় দেছে, আপনি কুমার॥
সে কথা শুনেছে সবে, জগৎ সংসারে।
প্রভাকর সাক্ষ্য আছে, জিজ্ঞাসহ তারে॥

কবিগণ।

যাহা হৌক্ ডাক তারে, শুনিব গো গান।
ছেলের মুখের গীত, অমৃত সমান॥

কুবিদ্যার ছেলে ডাকা।

আয় যাদু আয় যাদু, আয় ঝপ্ করে।
মহাগুণী কবি যত, ডাকিতেছে তোরে॥

গু নি তে ডাকিছে তোরে, পাবি রে খাবার।
আয় আয় আয় বাবা যাদু রে আমার ॥
গাহিবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে।
এতেক বিমল মুখে, মিষ্টদে খাইবে ॥*
আয় আয় ধনমণি, মুখ রাখ্ মার।
আমার হোস্ গো তুই, সর্ব্ব ধন সার ॥

ছেলে আসিতে আসিতে বলিতেছে

মাকো তোর চাবালেরে, ডাক্ দিলি ক্যান্।
যাতে নার্‌লাম মাগো, হাঁ—

মিত্র কবি।

—Walk up man.

কবীশ্বর।

কও রে কি নাম তোর, বাস কি নগর।

ছেলে

নাম বুনো অধিকারী, বেণাবনে গর্ ॥

মিত্র কবি

মাপ কর রাখ বাপু, ছুটো দিশি বোলে।
বল্ দেখি কিসে আলো, উপরেতে ঝোলে ॥

বুনো

চাতালেতে ওডা বুঝি, ডোমেতে বা বেচে।
ক্যাঁচের দোচনাওলা, জোলাইয়া দেচে ॥

---

* এতেক বিমল মুখে মিষ্ট দেখাইবে।

চট্ট

বল দেখি সাদা কেন, ঘরের দেয়াল।
মহা ব্যাধি হোয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল॥

বুনো

বুজি বা এ ভারে, পারে দোষে চিতাইচে।
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কায়ে হাগাইচে॥*

মিত্র

চট্ট এর ভাষা এ যে, বোঝা হলো দায়।
অনুবাদ করে বল, তবে বোঝা যায়॥†

কুবিদ্যা

ভেকো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড়।
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও বড়॥
দাঁড়ায়ে কি কর, গালি দেও যথোচিত।
না হয় গানেতে কর, সবারে মোহিত॥

বুনোর গীত

রাগিণী ঝিঝিট্। তাল খেম্‌টা।

হব সন্ন্যাসী এবার। হব সন্ন্যাসী এবার॥
কোণের ভিতর শুক্‌নো নাড়ী, সইতে নারি আর।
তোর্ সনে লো পিরীত করে, শিবের পূজা গেল ঘুরে,
অধিকারী নামটি ধরে, ঘন্টা নাড়া সার॥

কেমন গেয়েছি সবে, কও তো বিশেষ।

---

* অর্থাৎ বুঝি বা এটাকে পাড়িয়া ধরিয়া চিত্র করিয়াছে, কিম্বা কাক্‌কে দই ভাত্ খাওয়াইয়া হাগাইয়াছে।

† তাই কবি।

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ ॥

চট্ট

গাও ভাই ফিরে গাও, আর একবার।
শুনিয়া জুড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার ॥
অথবা শুনেছি তুমি, কবি মহাগুণী।
একটি কবিতা ভাল, পড় দেখি শুনি ॥
স্বপ্ন বা ধর্ম্মের ক্লেশ, ফেলে দেও জলে।
কহ তো প্রেমের গুণ, কবিতা কৌশলে ॥

বুনোর কবিতা পাঠ।

প্রেম সবে কর সার, প্রেমময় এ সংসার,
আকাশ পাতাল মহীতলে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি, প্রগাঢ় প্রণয়ে বাঁধি,
ভাসায়েছে সুখেতে সকলে ॥
প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক,
শিবের হইল ধ্যান ভঙ্গ।
সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে,
গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ ॥
শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে,
দেশে দেশে উদ্দেশিয়া নারী।
জ্বালা পায় কত বার, শেষেতে সে প্রেমে তার,
হইল বানর অধিকারী ॥
দ্বারকানাথ গো আর, গোপাল মাঝেতে তার,
মন বাঁধা গরু রাধিকায়।
দ্বারকায় লাজ খেয়ে, বরিল বানরী মেয়ে,
দাস জাম্বুবানের কথায় ॥
যিনি নিজে রামেশ্বর, রসিকের মণি।
ছিল তাঁর কত আর, রসিকা রমণী ॥

রুক্মিণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতী।
দ্বারকা স্বর্গের সম, ছিল শোভাবতী ॥
সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হরি।
মোহিনী মণ্ডল কোথা, সব গেছে মরি ॥
যত ছার পশু পক্ষী, বাসা করে তায়।
শৃগাল কুক্কুরে হাগে, দ্বারকার গায় ॥
তাইতে হইল মোর, কবিতার শেষ।

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ ॥

কবীশ্বর।

ভাল বটে দেখি তব, কবিতার ছটা।
পরে গালি দিতে তবে, এত কেন ঘটা ॥
কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপতি।
কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু অতি ॥
পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাকি।
তুমি তো বসেছ হয়ে, নিজে জয়ঢাকী ॥

বুনো-কবি।

না প্রভু নহিক আমি, অসভ্যের কেহ।
পালিত হয়েছে শুধু, তাঁর অন্নে দেহ ॥
ভাল করে গালাগালি, দিতে যারে তারে।
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে ॥
কত লোক দিছে কত, মুখে চূণ কালি।
তবু যারে তারে দিই, দোহাতিয়া গালি ॥
কিন্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়।
পরকে বলেছি তাই, অসভ্য তনয় ॥
চট্ট ভাবে দিছে গালি, আমি নহি পটু।
তাকেও বলেছি তায়, গোটা-তুই কটু ॥

গেলের বাজারে নাম, লিখেছি রাখিয়া।
চট্ট মিত্র মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া॥
কোন মূঢ়ে বলে ওরে, গালে আমি কম।
তারা জানে গাল মোর, শক্ত কি নরম॥
কিন্তু ভয় করে, পাছে, ফিরে গালি খাই।
হাতে পায় ধরে মানা, করিয়াছি তাই॥

চট্ট।

বুঝেছি চতুর বট, বুদ্ধি ঢের ঘটে।
গালি দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তিমত বটে॥
আঙ্গুর হইল টক্, পেলে না নাগাল।
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখিবে না গাল॥
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রতিরসে বালা।
ত্নদিন ঠেকিয়ে শিখে, তার যত জ্বালা॥
দিন ত্নই ঘরে গিয়ে, স্বামিঘর ছাড়ে।
যত আরো পতি সাধে, তত আরো বাড়ে॥
কোলেতে বসায় পতি, উঠে যায় কেঁদে।
সেই রঙ্গ দাদা ভাই, বসিয়াছে ফেঁদে॥
ছোঁড়াও তেমন নয়, ধরে এনে জোরে।
বুক পুরে মনোরথ, লবে পূর্ণ করে॥

বুনোকবি।

তুমি যে হে বলেছিলে, কটু কহিবারে।
আমি নাকি পারিনেকো, দেখ এই বারে॥

চট্টো।

বটে বটে খুব গালি, মিত্রে দেছ ভাই।
"মলমূত্র" আহারাদি, কিছু বাকি নাই॥
এক জোর ঘায়ে সব, করিয়াছ শেষ।
পাগল বুনোর ঘায়ে, যাব কোন দেশ॥

যেমন জনেক মূর্খ, রমণীর স্থান।
অরসিক বলে কত, হৈল অপমান॥
পীরিতে রমণী দিল, কাণ মুলে তার।
মূর্খ বলে রসিকতা, শিখেছি এবার॥
কত রস শিখিয়াছি, এই দেখ রামা।
কসালো ছুঁড়ির ঘাড়ে, বারো ইঞ্চি ঝামা॥
সেই রঙ্গ হলো তব, শুন ভাই বুনো।
কবিত্বে বাড়ালে তুমি, গালি দিয়ে দুনো॥
কেবল তোমার মুখে গালি না যুয়ায়।
কিন্তু হে একটি কথা, জিজ্ঞাসা তোমায়॥
কটুতে অপটু তুমি, বলিয়াছি বটে।
তুমি তা জানিলে বলো, কাহার নিকটে॥

বুনোকবি।

যে হোক্ না কেন তাতে, কি কাজ তোমার।
আগে বল দিছি গালি, কেমন এবার॥
তোমারে যা বলিয়াছি, বুঝেছ ত সব।
গোপনে বলেছি ঢের কর অনুভব॥

চট্টো।

গাল দেছ দড় দড়, হলো বাহাদুরি বড়,
বাড়িবেক যশ অবিরত।
আমরা শুনিয়া তায়, এসেছি কৃতজ্ঞতায়,
সেলাম বাজাতে গোটাকত॥
"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে"
সুবুদ্ধি মহৎ তুমিও ত।
তাই সব নমস্কার, ফিরিয়ে দিবে না আর,
সুবুদ্ধি মহৎ জন মত॥
কি সুবুদ্ধি সূক্ষ্ম তব, লোকে করে অনুভব,
যায় কি না যায় দেখা কিছু।

কেহ বলে কই কই, কেহ বলে, আছ ওই,
কেহ বলে দড়ি বাঁধো পিছু* ॥
হে উত্তরে মহল্লোক, একবার তেজে শোক,
সম্বোধিও নীচে মুখ ফুটে।
মনসুখে সব স'ব, কিছু মাত্র নাহি কব,
অঙ্গীকার করি করপুটে ॥

মিত্র কবি।

গালি দিলে প্রতিফল, অবশ্য পাইবে।
যেই মতি, সেই গতি, কেন না হইবে ॥

বুনোকবি।

এ মতি আমার নাহি, ছিল এত কাল।
কুবিদ্যা কুমতি দিয়ে, ঘটাল জঞ্জাল ॥
সুবিদ্যা সুমাতা ছেড়ে, এসে তার কাছে।
এই মতি এই গতি, শেষ ঘটিয়াছে ॥

কুবিদ্যা।

আমি তোর মাতা নহি, সে তোমার মাতা।
সে তোমার প্রিয় হলো, খেলি মোর মাতা ॥
আমি চলে যাই দেখি, কে কি করে তোর।
এখন করিবি তুই, কোন্ মা'র জোর ॥

কুবিদ্যা প্রস্থান ও বিদ্যা পুনরাগমন করিলেন।

বিদ্যা।

কেন বাছা তোরা সবে, কলহ করহ।
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ ॥
সকলে একত্রে মোরে, আরাধনা কর।
সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বর ॥

* অতি বুদ্ধি।

সদাই সদ্ভাবে তবে, কেন না চলহ।
কি কারণ কর সবে, কেবল কলহ॥

মিত্র।

তাই আমি কত বার, বুঝায়ে লিখেছি।
তার ফল গালাগালি, কেবল দেখেছি॥

অধিকারী।

আমি ত দিই নে গালি, ওদের দুজনে।
শুধু কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে॥
করিলাম অপরূপ, স্বপন রচনা।
জগতেরে জানাবারে, নিজগুণপনা॥

বিদ্যা।

কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, নিজ মনে লাগে।
কবিতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে॥

অধিকারী।

যে জন মিলায় শব্দ, সুকোমল ভাষে।
সেই ত সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে॥

বিদ্যা।

তা নয় কবিতা বাছা, তা নয় তা নয়।
রামায়ণ প'ড়ে তত, সুকবি না হয়॥
মুগ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন॥
যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন॥
সুখ দুখ রিপু রসে, হৃদয় মাঝার।
প্রকৃতির মোহ সনে, জন্মে যে বিকার॥
যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাষে আপনা সনে, হৃদয় সম্ভাষে॥
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহময়।
শুধু রাম রাম বলা, কবিতা তো নয়॥

কিন্তু রামনাম তুমি, ছাড়িবে না দেখি।
বতে প করিয়ে কবি, কয় যত ঢেঁকি ॥
সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ।
কবি ঈশ্বরের ঠাঁই, লহ উপদেশ ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

[ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন,' ৩ অক্টোবর ১৮৫৩ ]

## শরদ্বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন।

কামিনী।

নলিত।

আ মরি, আ মরি মরি, আজিকার বিভাবরী,
নাথ কি দেখেছি শোভা, আ মরি আ মরি হে,
নিরমল নীলাম্বরে, ধীরে চলে শশধরে,
বিমল কোমল করে, সার আলো করে হে ॥
অসীম বিমল নীলে, বিধুকর গেছে মিলে,
মাঝে তারা পূর্ণশশী, শত শোভা ধরি হে।
গেছে জলদের ফাঁদ, শরতের পূর্ণ চাঁদ,
অমল মোহন শোভা, ধরা বয় পরি হে ॥
যৌবনে নবীনা নদী, ধীরে ধীরে নিরবধি,
প্রেম গান মৃদু গেয়ে, চলিছে সুন্দরী হে।
নিরমল বুকে তার, শশী তারা ছায়াকার,
সমীরণ নেচে যায়, যেন প্রেমেশ্বরী হে ॥
তৃণপূর্ণ তটে তার, ফুল নাচে অনিবার,
শশী কিবা শোভা পায়, হৃদয় উপরি হে।
স্মর বুঝি সেই স্থানে, নিয়েছিল ধনুর্ব্বাণে,
মারিল আমায় প্রাণে, যাতনায় মরি হে ॥

পতি।

আমিও দেখেছি সখি, তেমতি প্রকার।
সকলি তেমতি মত, শরীরে তোমার॥
ঢল ঢল দেহ-নদী, নবীন হিল্লোলে।
মাঝে তার মুখখানি, শশধর দোলে॥
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে।
কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে॥
জোর বায়ু লয় প্রাণ, পালেতে কি কাজ।
বুকের বসন পাল, নাবাতে কি লাজ॥
অমনি চলিবে তরি, কাণ্ডারীর গুণে।
কাজ নাই পার্লে সখি, কাজ নাই গুণে॥
চল সখি বার যাই, গভীর সলিলে।
ডুবে মরি সেও ভাল, স্বর্গ তাহে মিলে॥
সে বরং ভাল সখি, জল খেয়ে মরি।
চড়ায় ঠেকিলে তরি, উপায় কি করি॥
এ যে বড় দায় দেখি, বালির চড়ায়।
জল্ দে জল্ দে সখি, তৃষায় পোড়ায়॥
হা জল যো জল করি, চারি পাশে চাই।
কেবলি যে বালি আর, ঘোলাজল পাই॥
দেও লো রমণীমণি, এক বিন্দু জল।
তৃষায় বাঁচুক প্রাণ, হই লো শীতল॥
নির্দ্দয় অন্তর তুমি, স্বভাবত নারী।
তৃষা কি জান লো আগে, তবে দেবে বারি॥
আ মরি রেগো না ধনি, আমার উপরে।
বালিকা বলেছি শুধু, রাগাবার তরে॥
আসিতেছে এই সবে, যৌবন জুয়ার।
পূরুক্ পূরুক্ ধনি, দিব লো সাঁতার॥
হবে কি এমন দিন, কপাল আমার।
এ নদী কাঁপিয়া হবে, অকূল পাথার॥

ঝড় কালে ঝড় হবে, তুলিয়ে তরঙ্গ।
করিবে নিশ্বাস-বায়ু, হৃদি মাঝে রঙ্গ॥
তরঙ্গে দুলিবে নদী, ঢেউ তুলে তুলে।
আমার কলার ভেলা, যাবে দুলে দুলে॥
রেগো না রেগো না ধনি, মরি, রেগো না লো।
বড় নদী বলি নাই, বলিয়াছি ভালো॥
কে জানে যদ্যপি এই, শরতের কালে।
একটানা ভাঁটা পাছে, ঘটে লো কপালে॥
ভরা গাঙ্গে পাল দিয়ে, ভেলা যেতে চড়ে।
দয়ে পড়ে যাবে ধনি, কপালে দ-পড়ে॥
যাক যাক রাগাবো না, আর লো তোমায়।
কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষমা কর তায়॥
যেমন দেখেছ তুমি, দৃশ্য চমৎকার।
তেমতি দেখেছি ধনি, স্বরূপ তাহার॥
ঢল ঢল দেহ-নদী, যৌবন হিল্লোলে।
তার মাঝে আঁখি মুখ, তারা শশী দোলে॥
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে।
কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে॥
ফুলগুলি আশে পাশে, অলঙ্কার ভার।
কি কব রূপের কথা, নদীর আমার॥
মদন ছিল না, কিন্তু তবু কাম কিসে।
অন্তর ফেলিল বিঁধে, তার শর বিষে॥
পয়োধরে পঞ্চশর, জেনেছিল হর।
বুঝি এসেছিল তথা, করিতে সমর॥
রণে কাম পরাজয়, যেখানেতে ভব।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে গেছে, ভ্রূ কটাক্ষে তব॥

কামিনী।

যাও যাও কাজ নাই, কথা কয়ে আর।
ভরা গাঙ্গ খুঁজে নিয়ে, দেও গে সাঁতার॥

পতি।

মরি এ নয় সোজা, রমণীর মন বোঝা,
কি কথায় করিয়াছ রোষ।
ছিছি ছিছি ছিছি প্রাণ, ছাড় ছাড় ছাড় মান,
ক্ষম মোর যদি থাকে দোষ॥
মুখ ম্লান দেখে শশী, গগন মণ্ডলে বসি,
হাসিতেছে প্রফুল্ল বদনে।
ছিছি ছিছি করি মান, তাহারি বাড়িল মান,
অপমান কেবলি আপনে॥
পায় ধরি রসবতি, কথা কও প্রাণ।
কেন লো যুবতি সতি, কেন কেন মান॥
দেখ দেখি প্রাণেশ্বরি, কুমুদিনী জলে।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, প্রেমসুখে গলে॥

কামিনী।

না হে না হে না হে প্রাণ, সেও যে করেছে মান,
ছায়া ছলে অধোমুখ করি।
তাই শশী ছায়া ছলে, পায় ধরে গিয়ে জলে,
তবু মানে রহিল সুন্দরী॥
কাঁদে চাঁদ যাতনায়, জলে বুক ভেসে যায়,
ঐ কলঙ্ক অশ্রুধারা দাগ।
ছাড়ে শ্বাস দুখভরে, কাঁপে শশী কলেবরে,
জলে ঐ দেখে ছাড় রাগ॥

পতি।

তা নয় তা নয় প্রাণ, তার তরে নয়।
তার তরে নাহি জলে, শশধর রয়॥
তোমার বদন শোভা, দেখি শশধর।
লজ্জায় ডুবিয়া মরে, জলের ভিতর॥

যাইতে জলের মাঝ নিবারি তোমায়।
পাছে তব মুখছায়া জল মাঝে যায়॥
জলে ডুবে তবু চাঁদ, হয়ে অপমান।
সে ভয়ে ঐ দেখ শশী, জলে কম্পমান॥
মনেতে ভাবিয়া দেখে, ডুবিয়াছে জলে।
তথাপি নিস্তার নাই, লজ্জার অনলে॥
তাই বুঝি ছার প্রাণ, রাখিবে না আর।
হৃদয়ে করিয়ে ছিল, অস্ত্রের প্রহার॥
রুধির পড়েছে তারি, ধারে ধারে বুকে।
তার চিহ্নে কলঙ্ক. বলিছে সবে মুখে॥
যদি বল চাঁদ যদি, ডুবে গেছে জলে।
কি ওই প্রকাশে শোভা গগনমণ্ডলে॥
সে তোমার মুখছায়া, পড়েছে আকাশে।
তোমারি মুখের মত, সুশোভা প্রকাশে॥
চিকণ চাঁচর কালো, যদি পড়ে গালে।
ছায়াতেও সেই দাগ, হয় সেই কালে॥
কালো কেশ ছায়া পড়ি, কালো দাগ হয়।
না জেনে কলঙ্ক চিহ্ন, মূর্খ লোকে কয়॥
কতমত করি রাখ, বদনে বসন।
কভু পূর্ণ কভু কিছু, ঢাকহ বদন॥
তাই হয় কমী বেশী, আকাশের ছায়া।
লোকে বলে তিথিগুণে, বাড়ে চাঁদকায়া॥
কিন্তু আর মিছে কথা, কাজ নাই কয়ে।
শরদ যামিনী যায়, মিছেমিছি বয়ে॥
কেন আর প্রাণেশ্বরী, বাহিরেতে রহ।
এখনি আসিবে রবি, কমলিনী সহ॥
দেখিব তখন ফের, স্বভাবের ছবি।
প্রখর ক্রমেতে হবে, শরদের রবি॥
সোহাগিনী কমলিনী, মোহিনী সাজিবে।
হেসে হেসে মনসুখে, মরমে মজিবে॥

কামিনী।

বরষা কালেতে রবি, ছিল হে মলিন ছবি,
শরদে প্রখর কেন হবে।
তখন নলিনীচয়ে, ছিল হে মলিনী হয়ে,
এখন প্রফুল্ল কেন রবে ॥

পতি।

দ্বিপ্রহরে দিনমণি, প্রেয়সীর পানে।
চেয়ে দেখে প্রেমভরে, গদ গদ প্রাণে ॥
দেখে কোথা থেকে আসে, কমলিনী কাছে।
আর এক দিনমণি, জলে পড়ে আছে ॥
না জেনে আপন ছায়া, মনে রাগিয়াছে।
বলে বুঝি পদী ছুঁড়ী, এর সঙ্গে আছে ॥
রাগেতে প্রচণ্ড তেজ, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
হইয়াছে দিনমণি, কমল উপর ॥
মনে ভাবে মাপ চাবে, দাঁতে করি কুটো।
পদী বলে হলো ভাল, মিলে গেল দুটো ॥
এই ভেবে মহানন্দে, হাসি-ভরা মুখ।
এমনে জানে না ছুঁড়ী, উপপতি দুখ ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজীয় ছাত্র।

[ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন,' ২৪ অক্টোবর ১৮৫৩ ]

রূপক

## বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন

পতি।

বসন্ত বাসরে মরি, যায় রবি ধরা হরি,
ধরণী কি শোভা ধরি, দেখ না লো দেখ না।
মহী লো মোহিল মনে, মোহিনি লো সঙ্গোপনে,
বিনে তাহা দরশনে, থেকো না লো থেকো না ॥

স্ত্রী।

বসন্তে বিষম স্মর, কালের কুসুম শর,
লক্ষ করে বক্ষোপর, যাব না হে যাব না।
সহজে অবলা নারী, জ্বালা সহিবারে নারি,
সে বাণে নির্ব্বাণ বারি, চাব না হে চাব না॥

পতি।

স্মর শরে প্রাণেশ্বরী, কেন সরে মন।
কি ভয় থাকিতে আমি, তব নিকেতন॥
মারে যদি মারে শর, তব বক্ষোপরি।
হৃদে হৃদি দিয়ে আমি, লব বাণ ধরি॥
কহ লো নিরখি সখি, কেমন কৌশল।
মহীর সুশোভা শত, সবল সকল॥
সুধাকরে সুধা করে, হাসে ফিরে বার।
এখনো বদন-চন্দ্র, দেখে নি তোমার॥
দেখাও দেখাও সখি, দেখাও বদন।
পূর্ণেন্দু পড়িয়ে লাজে, পলাবে এখন॥
না লো না লো থাক্ শশী, বিহরি গগনে।
নহিলে মহিলা তুমি, মজিবে আপনে॥
গগন মণ্ডল মাঝে, নিশাকর বিনে।
গ্রাসিতে গগন গ্রহ, গ্রহণের দিনে॥
প্রবল পামর রাহু, আইলে ধাইয়ে।
যখন যামিনীনাথ, দেখা না পাইয়ে॥
তব মুখ-শশী ভ্রমে, পাছে আসি গ্রাসে।
গগনে থাকুক চন্দ্র, বলি সেই ত্রাসে॥
কিন্তু লো তা হলে রাহু, বাঁচিবে না আর।
বেণী-ফণি-বিষ খেয়ে, বাঁচে সাধ্য কার॥
দেখ প্রিয়ে প্রভাকর, প্রখর প্রচণ্ড।
অহঙ্কার চূর্ণ তার, কর এই দণ্ড॥

বাহিরে এস লো প্রাণ, এস লো বাহিরে।
চাঁচর নীরদ ভয়ে, তাড়াও মিহিরে॥
নলিনী হইতে চায়, উপমা তোমার।
নাথেরে না দেখে লবে, গরবিনী আর॥
না লো না লো এস না লো, থাকিতে তপন।
তা হলে পাব না তব, মুখ দরশন॥
বদন চন্দ্রমা হলে, দিনেশ নিকটে।
রবি চন্দ্র মিলনেতে, পাছে কুহূ ঘটে॥
তথাপি লো প্রাণেশ্বরি, তাড়াও মিহিরে।
বাহিরো বাহিরো প্রাণ, বাহিরো বাহিরে॥
কমল কলিকা ফুল, বসন্ত বাতাসে।
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কর, বদন প্রকাশে॥
না লো শশিমুখি মালা, তা করিতে করি।
সলিলে সরোজ থাক্, যাক প্রাণেশ্বরি॥
মধু পানে মধুকর, আসিবে যখন।
যদি নিজ কমলিনী, না করি দর্শন॥
ভ্রমে ভ্রমি তব মুখে, ভ্রমে সে ভ্রমরে।
জানি পদ্ম মুখে পাছে, মধু পান করে॥
তবু এস এস সখি, এস লো তথাপি।
তোমা বিনা রহিবারে, না পারি কদাপি॥

স্ত্রী।

কিন্তু যে মলয় বয়, সুশীতল অতিশয়,
অগ্নিমাত্র নাই সঙ্গে তার।
বিরহে সখা না পায়, সখার সন্ধান চায়,
সমীরের বিরহ বিকার॥
বিরহী সে সমীরণ, করিব না পরশন,
বিরহীর গায়ের বাতাস।
ওই শুন তার তরে, কে যে, 'কুহূ কুহূ' স্বরে,
কুণ্ড বায়ু কয় তব পাশ॥

পতি।

কুহূ কুহূ শুন যাহা, সুমধুর স্বর।
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি, অতি মোহকর॥
মানবমণ্ডলী মূঢ়, না জেনে সকলে।
কোকিল কলনা কুহূ, সে ধ্বনিকে বলে॥

স্ত্রী।

রহস্য ছাড়িয়া দাও, আমার হে মাথা খাও,
কেন কর উন্মত্ত প্রলাপ।
যদি প্রতিধ্বনি হবে, ওই দেখ কুহূ রবে,
কূজিতেছে কোকিল কলাপ॥

পতি।

আকাশে বিকাশে প্রিয়ে, দেখি দিবাকর।
ধরায় হতেছে ধরা, তব কলেবর॥
বদনে বিকাশে বিধু, তোমার প্রেয়সি।
সরোজিনী সখা সহ, সপ্রকাশ শশী॥
রবি শশী একত্রেতে, বুঝি কুহূ হয়।
তাই লো কোকিলকুল, কুহূ কুহূ কয়॥

স্ত্রী।

বল দেখি তরুদল, কি কারণ ঝলমল,
করিতেছে নবীন পল্লবে।
বোধ হয় সেই ছলে, নবীন পল্লবদলে,
নব বেশ পরিয়াছে সবে॥

পতি।

বসন্ত যৌবন দিন, পেয়ে সবে রসাধীন,
হলো তরু নব লতা আর।
পুষ্পেতে পূরিল সব, হইয়াছে পুষ্পোৎসব,
ফুল ফুটিয়াছে সবাকার॥
সে কারণে রীতিমত, তরুগণে প্রথমত,
শিশিরেতে করিয়াছে স্নান।

পরে বৃক্ষ লতাদলে, করেছে নবীন দলে,
নব বেশ ভূষা পরিধান ॥

স্ত্রী।

গুঞ্জরে ভ্রমর কেন, নিকুঞ্জ নিকরে।
'গুণ গুণ' করি অলি নিকরে কি করে ॥

পতি।

যতেক নাগর কুলে, প্রফুল্ল কুসুম তুলে,
নাহি দেয় মধু মধুকরে।
অলি তায় ক্রোধভরে, অস্ত্র অন্বেষণ করে,
জ্বালা দিতে নাগর নিকরে ॥
করিতে মানস পূর্ণ, দর্শন করিল তূর্ণ,
তব ভ্রূ মদনধনু মত।
কিন্তু তাহে গুণ নাই, গুণ চেয়ে ভ্রমে তাই,
গুণ গুণ রবে অবিরত ॥

কামিনী।

নিরমল নীলাকাশ, শশধর সপ্রকাশ,
বসন্তের বিভাবরী, কিবা শোভা ধরিছে।
কেন দরশন করি, শশাঙ্ক গগনোপরি,
পাশে লক্ষ তারাগণ, কত শোভা করিছে ॥

পতি।

গগন তোমার রূপ, করে দরশন।
সহস্র তারার চেয়ে, সহস্র নয়ন ॥
শশাঙ্কের দীপ জ্বেলে, দেখে ভাল করি।
বায়ু শব্দে প্রশংসায়, বলে মরি মরি ॥

কামিনী।

দেখ দেখ প্রাণসখা, কুসুম নিকরে।
নেচে নেচে হেলে দুলে, কত শোভা করে ॥
কেহ রাঙ্গা, কেহ নীল, শ্বেত কেহ কেহ।
বিমল কোমল কিবা তাহাদের দেহ ॥

পতি।

শুনিয়ে তোমারি ভূষণ রব।
মনে করেছিল কুসুম সব॥
দল বেঁধে বুঝি আনি নিকরে।
এসেছে বুঝি বা মধুর তরে॥
মনে করিয়াছে দিবে না মধু।
ছুলে ঘাড় নাড়ে 'না না না বঁধু' ॥
কারো কারো ছিল বরণে তম।
বলে কেহ নাই আমার সম॥
কিন্তু তোমা দেখি সে লাজ পায়।
অধোমুখে দেখে কি বর্ণ পায়॥
তাই হেঁট মাথা কুসুমচয়।
কেহ অভিমানে বৃক্ষে না রয়॥
বরণ নাশিতে ভূমেতে পড়ি।
কাদা মাখি দেয় ঐ গড়াগড়ি॥

কামিনী।

মলিন ছিল হে কমল শীতে।
বসন্তে কেমন সুপ্রকাশিতে॥
কেমন সুন্দর আ মরি মরি।
মনে হয় যেন হৃদয়ে ধরি॥
ফুটেছে সকল কমলদল।
রক্তিম শ্বেতাক্ত সুনিরমল॥
তাহার উপর নীহার কণা।
আশে পাশে শোভে দেখ দেখ না॥

পতি।

সরোজিনী সদা দ্বেষেতে মরে।
তোমার সমান হবার তরে॥
দেখেছে তোমার বদনোপরে।
পাশে স্বর্ণ ভূষা কিরণ করে॥

তেমনি কিরণ দিবার আশে।
নীহারের কণা রেখেছে পাশে॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হুগলি কালেজের ছাত্র।

## গদ্য

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৩ এপ্রিল ১৮৫২ ]

**ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।**

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে কদাপিও মূঢ় মানব মণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে তাহার কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণা-কীর্ণ লক্ষ২ রক্ষো, যক্ষ ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড২ করিবেক। যে লপনেন্দু শত২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অণুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রস না পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদর্য্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদগ্রস্ত হয় নাই, এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলি হইয়া

যাইবেক। ধরাবাসিদিগের এই ধারা দর্শনে অশ্রু ধারা ধারে ধারে ধারণ হয় অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।

হুগলি কালেজ। শ্রীব, চ, চ,।

[ 'সংবাদ প্রভাকর,' ১০ জুলাই ১৮৫২ ]

( গুণাকর জনসহ সাক্ষাদভিলাষে নিরাশ জনস্থ বিরচিত )

## বর্ষাঋতু।

স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধারমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিণি যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ববিহারি শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-বিদারক ভীষণাশনি নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারি বিন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। চিরাশাবলম্বিনী চাতকী ধরাধর বর্ষিত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘোর সজল জলদাবলী সন্দর্শনে শিখাবল শত২ নীল নিশাকর বিরাজিত পুচ্ছবিস্তারিত পুরঃসর নৃত্য করিতেছে, নিদারুণ প্রখর কর ধর বিভাকর বিশালজীমূত জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, ললিত লপনা ললনা করাম্ভোজ স্বরূপা বিমলা কমলিনী ম্লানমুখে মুদিতা হইল মনোমোহিনী মহিলা মালা মুখচ্ছায়া কনক চক্রাকার চারুচন্দ্রমালা জলধর জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, নিশাম্বর শোভনতারকা মণ্ডলী অদৃশ্য হইল।

নিদাঘীয় প্রখর প্রভাকর প্রতাপে ম্লান স্বভাবাচ্ছন্না বিপুল লাবণ্যবতী হইল মহীরুহরাজী নবদলমালায় ঝলমলায়মান হইতেছে। বিদ্যুল্লতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতৃরক্ষাবলম্বন সদৃশ নব লতিকামালা মহামহীরুহরাজীকে অবলম্বন করিতেছে বৃক্ষলতা সুশোভিতা বসুন্ধরা সুন্দরী, বহুল কনকালঙ্কারমণ্ডিতা চন্দ্রলপনাসঙ্কাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পূর্ণ যৌবনা, বিশাল বেগবতী, ভীষণ কল্লোলোন্মত্তা, তরল তরঙ্গ রঙ্গিণী, স্রোতস্বতী, স্বনাথ সাগরে শরীর সমর্পণ করিতেছে, হে নয়ন যুগল! এতন্মনোরম পদার্থপুঞ্জে সন্দর্শন সার্থক হও।

হুগলি কালেজ। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

## জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা*

# জীবনী

[ ১২৮৩ সালে প্রকাশিত ]

দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতি মাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই;—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? স্নুতরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না।

---

* দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালে। এই গ্রন্থাবলীর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী" লিখিয়া দিয়াছিলেন। পরে রচনাটির স্বত্ব তিনি দীনবন্ধুবাবুর পুত্রদের দান করেন এবং উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন। এই জীবনী সর্ব্বপ্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে, ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৷৹।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ( বঙ্গাব্দ ১২৯৩) দীনবন্ধুর বাল্যরচনা-সম্বলিত গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য ( গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া ) বঙ্কিমচন্দ্র "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৮ শালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

> "এলোচুলে বেণে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়,
> নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়।"

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যত দূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর তত দূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (Wit) প্রধান; দীনবন্ধুর

লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যত দূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র"-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন"-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, উহা কখন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পংক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া॥

একটি কবিতা এই

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥

আর একটি

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ॥
ইত্যাদি।

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে, "জামাই-ষষ্ঠী" নামে দুইটি কবিতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের "জামাই-ষষ্ঠী" যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা

পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠী"তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদপত্রে "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে"র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল।

দীনবন্ধু প্রভাকরে "বিজয়-কামিনী" নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে "নবীন তপস্বিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০৲ বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড় শত টাকার পোষ্টমাষ্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের কার্য্যের নিয়ম এই ছিল, যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্ট আপিসের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেড-কোয়াটরে স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া

যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতই তিনি ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন, যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ, পোষ্ট আপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ-প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল, যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ

দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম, যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্বচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগের উদ্ধার করিল।

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়ার বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপরনিউমররি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য্য কয় বৎসর অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথম-শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ, এই দুই জন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ, তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শত বার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকটরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচারবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটক-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম, যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

নবীন তপস্বিনীর পর "বিয়েপাগলা বুড়ো" প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগুলিন গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। "নীল-দর্পণে"র অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত; "নবীন তপস্বিনী"র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "সধবার একাদশী"র প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। "জামাই বারিকে"র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "বিয়েপাগলা বুড়ো"ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং "প্রচলিত খোসগল্প" হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি

করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক; "জলধর," "জগদম্বা" "Mary Wives of Windsor" হইতে নীত।

বাঙ্গালি-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজী গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না, জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থ-মূলক্ নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন-গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিদ্, ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?

"সধবার একাদশী" "বিয়েপাগলা বুড়ো"র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা "নিমচাঁদ"কে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।

"লীলাবতী" বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিনখানি কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়, "Lady of the Lake" নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ করিলেন, গদ্যকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা যোলখানি নবেল। "Kenilworth" নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের যে সম্বন্ধ, "Ivanhoe" এবং "Kenilworth" প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদ্যকাব্যের সেই সম্বন্ধ।

"লীলাবতী"র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছু কাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর "সুরধুনী কাব্য," "জামাই বারিক" এবং "দ্বাদশ কবিতা" অতি শীঘ্র শীঘ্র

প্রকাশিত হয়। "সুরধুনী" কাব্য অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ বিয়েপাগলা বুড়োরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ ছিল।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলে কামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যলোকে—চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব—অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন, বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার

কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী। এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত্ বাতাস দিতেন। নির্ব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, এক দিন তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচিবে না।" দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "কে বলিল?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাঁহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শুখাইয়াছে কি না আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে, সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটি বাম পদে হইল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।"

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া, শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, "কই, রাগ যে হয় না।"

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই-বারিকের "ভোঁতারাম ভাটে"র উপরে। যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষকর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না; যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে, সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্ব্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন "নবীন তপস্বিনী" প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরির উমেদারী করিয়া নিষ্ফল হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন,—নিম্ন শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাঁহার সমুচিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "কলিকাতা রিবিউ"র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দেখিলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। "ভোঁতারাম ভাট" দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক!

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎ কার্য্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্য্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা

অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমত কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।

দীনবন্ধু আটটি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি সংসারের একটি প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

---

# কবিত্ব

[ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ]

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রহস্যসন্দর্ভে [ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' ? ] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায়, যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালির দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানা পল্লীগ্রাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সম্বাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সম্বাদপত্রে লেখকেরা আবার সচরাচর ( সকলে নহেন ) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না, যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি ? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি ?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ

হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realsim, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনূমান্ বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ, কি রাইচরণ, একটা আদুরী, কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতিশক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে: সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের

সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়নকালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন, যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল, যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত, যে, আমরা বুঝিতে পারি না যে, এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা, দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত! কিছু বাদসাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না, কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি, যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে

তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আহুরীর সৃষ্টিকালে আহুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত,—"তুমি আমাকে তোরাপের বা আহুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না, যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আহুরীর ভাষা ছাড়িলে আহুরীর তামাসা আর আহুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—যে "না তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আহুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আহুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হউক আর মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী তীব্রা সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্ব-ব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা—(hero এবং heroine,) তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আহুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আহুরী বা তোরাপের বেলা

তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল ; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন ? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন ? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজিকাল না কি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন, আমি ইহাও বুঝাইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতি নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার

কবিত্ব সফল হইত। যদি একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহুসংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া যদি বিন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলেও এখানেও কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজী সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্নপ্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। শেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীল-দর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীল-দর্পণ, নীল-দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীল-দর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞকথাটায়ং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীল-দর্পণ তাঁহার প্রণীত ড ভালবাসিবার অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীল-দপ বাসিত, আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তা নাই-ভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট; তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীল-দর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ গুণের যে উৎপত্তিস্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে।

বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি, ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।

**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

[ ১২৯২ সালে প্রকাশিত ]

## উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি-ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা-কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা-কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যে-ই কেলা-কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এত ক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিসটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোন্‌স্‌, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মা'র প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মা'র প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মা'র প্রসাদ। মা'র প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মা'র প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মা'র প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# বাল্য ও শিক্ষা

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্বপারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার এক মাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

---

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না: মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ-মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কুঠিতে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে রে ?—কে যায় ?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস ?"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস

বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনেরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, একগাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ-সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই

উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্য়ে কলূকেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came !

তাই না কি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত-রচনাশক্তি ছিল। বীজ-গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখাপড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন-পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখাপড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস না কি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজকাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক্ নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র

বাল্যে পড়াশুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম ?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতি শীলের গল্প শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড়মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না ?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটী পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।"

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, এক মাস কি দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুরবাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার

গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থানপূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখাপড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুরবাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা গাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র কাঁচরাপাড়ার এক জন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তিপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি, আধুনিক বর-কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর-বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## কর্ম্ম

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া ; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও

সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায় সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে ( ১২৩৯ সালে ) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে "সংবাদ রত্নাবলী" আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকরপ্রভাকরকর বহু কাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন

না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।”

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতা দ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।”

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম ;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস্ পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।”

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ইঁহারা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৮ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ডহস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ

আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্য-ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ-কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ-কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল-কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও-দিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতি বর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান্ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং

কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক এক খানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয় বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে। সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়নপূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্বলের ধনবান্ জমিদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত

স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহু কষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধ প্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতি মাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিতপ্রভাকর" এবং "বোধেন্দু-বিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশে"র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা "নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টিই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়;—

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবা মাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর-বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভীষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু মাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্রভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত সে-ই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান্ শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন; মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে-কোন শ্রেণীর যে-কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে-কোন সময়ে তাঁহাকে যে-কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক (১) দুই (২) তিন (৩) চারি (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

---

(১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাৎসর্য্য, (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ" মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

তিনি সুরাপান করিতেন, এ জন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দীভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তি-শক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## কবিত্ব

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি ?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানী মাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি"। ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন-গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি—তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি—পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ-ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার

কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামিপুত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামিভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ডভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ডভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতা-পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মা'র পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্শা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা, কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু

যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখি নি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায় দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত—

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সখের বাবু, বিনা সম্বলে,—

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসেমাছ লইয়া আনন্দ—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥

মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে—

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা—

সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধি চোসার" দল গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্‌সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন রূপেই অশ্লীলতার বিন্দু মাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্য ভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল।

ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মা'র বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্য রত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্প বয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরূষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। সে কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না; যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস

বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফআখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা ঊরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা ঊরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা, কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃসমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিস সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতা-পরা মল-পরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীমুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা

দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি, কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেক বার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দু-ই বুঝাইতে হয়। শুধু তাহাই নয়। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে?

তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটাকে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন, সেগুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়টি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের

---

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।*

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

* কবিতাসংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানা দিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এত দূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।  
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥  
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি!  
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥  
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।  
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।  
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥  
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।  
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দেয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

শাকান্ন মাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধা রস্যাঃ স্থিরা হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

স্থূল কথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহার ত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপসের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছু মাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে

তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য, এমন কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,  
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,  
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।  
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,  
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥

বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥ ২
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥ ৩

## রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস ॥ ১
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ

পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজি-নবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলা-কা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। এক দিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিবাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর এক দিকে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনো জল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত ; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাববর্ণনা 'নবজীবনে' বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী," "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরম ধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম মাতৃভাষা," সৌভাগক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি," এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে

যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, স্থতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এ জন্য কেবল আমার পছন্দমত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর," "বোধেন্দুবিকাশ," "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না, সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

# BENGALI SELECTIONS

Appointed by the Syndicate of the Calcutta University for the Entrance Examination 1895.

[ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ]

## PREFACE

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as is possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigour and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the *Mahabharata*, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa, Babu Bhudeb Mukerjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu Rajkrishna Mukerjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar. Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be

made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writing with some reluctance. They had a place in all previous selections ; their exclusion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give their own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE.

## বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান

[ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'এর ভূমিকা ]

সাত আট বৎসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতার সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনর্ম্মুদ্রিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উক্ত মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের এক জন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজীতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাবসকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কারস্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায়

---

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

না; কেন না, হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক।* তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না,—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, এক জন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত; কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ

* ইহা প্রবাদই, কারণ ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে অধুনা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে রামরাম মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি গদ্যলেখায় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।—সম্পাদক।

এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়া মাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই এক মাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে, "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে

প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।

**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**

# ৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী

[ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ]

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে। কাল আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ গুণ উভয়ই কীর্ত্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দু-ই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল।

---

* ইঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষ গুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না; কেন না, কিছু কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি।* তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁহার জন্মকালে তিনটি গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কি না।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরু মহাশয়

---

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই "দাদা মহাশয়," কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল ; কেন না, তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছু কালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার এক জন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্প কাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ-স্কুলে, কাল ও-স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষা-বিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্ত্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা ; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে

হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চ্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা কিছু কালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এক দিন হেড মাষ্টর গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানরসম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানরসম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক: কেন না, লেখাপড়া করার ভান করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানরসম্প্রদায়ের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূরদেশ। এই সম্বাদ যথাকালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সম্বাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার

স্বভাবচরিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক্‌ আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে, তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভাবলে, অল্প দিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটি সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন, ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে-কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া ল-ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র

পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইন্‌কম টেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিসটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্বসকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, ( ১ ) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা, ( ২ ) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, ( ৩ ) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, ( ৪ ) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; তাহার কারণ, ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills *vs.* Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না, সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে আন্তরিক অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃদ্‌সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস-ভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথনাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক, তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে, তখন প্রথম সেন্‌সস্ হইল। এ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব Inspector General of Registrationএর উপরে অর্পিত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল ঠিকঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন ; কেন না, তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যরচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র-সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া

আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ," "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জাল প্রতাপচাঁদ," "পালামৌ," "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সে-ই মাজিষ্ট্রেট, সে-ই রেজিষ্ট্রর। ভারতে আসিয়া বার্টনের এক মাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর

তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এত দিন তাঁহার ভয়ে সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা ও চক্ষুলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি "মুশুরিবাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাতমৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এ জন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# পাঠ্য পুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ-জীবনে দুইখানি পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। একখানির নাম—'সহজ রচনাশিক্ষা'; ইহার প্রথম সংস্করণ কোন্ সালে প্রকাশিত হয় জানিতে পারি নাই; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯৪ (ডিসেম্বর), ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা চতুর্থ সংস্করণের পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত অপর পাঠ্য পুস্তকখানির নাম—'সহজ ইংরেজী শিক্ষা'। এই পুস্তকখানি আমরা এখনও দেখি নাই। তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, ইহার তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৪ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

## ADVERTISEMENT

It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the Vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect ; there exist no rules for his guidance, none at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on *Composition* has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.

The first chapter of this primer seeks nearly to teach the beginners to form words into sentences and then to collect sentences into little essays. In the second chapter he has explained the existing practice of the best writers under three heads, (1) Correctness, (2) Precision, and (3) Perspicuity. He has entered into no elaborate discussions, but has simply laid down rules easily understood. In the third chapter he has explained the existing practice regarding that particular species of composition, with which, of all others, every person, in whatever rank of life, is required to be most conversant—I mean letter-writing, the most useful of all forms of composition. He wished to add a chapter teaching the drawing up of ordinary legal instrument, such as leases and bonds. But he prefers to wait to see the reception which the little work meets with, before adding further to its bulk. The same consideration, *viz.*—a wish to avoid adding to the size and therefore to the cost of a primer which ought to be in every beginner's hand, has led him to content himself with a limited number of illustrations and examples under each head. More can be easily supplied by the teacher.

In conclusion he begs to say that this little primer is based on no English model, and that the only two terms used by English writers on the subject which he has rendered into Bengali are *Subject* ( বিষয় ) and *Predicate* ( বক্তব্য ) ।

# সহজ রচনাশিক্ষা

---

## উপক্রমণিকা

আমরা যাহা মনে করি, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করিতে হইলে, হয় মুখে মুখে বলি, নয় লিখিয়া প্রকাশ করি। মুখে মুখে বলিলে, লোকে তাহাকে কথোপকথন বা অবস্থাবিশেষে বক্তৃতা বলে। লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে, চিঠি, সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদিতে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু মুখেই বলি, আর লিখিয়াই বলি, বলিবার সময়ে কথাগুলি একটু সাজাইয়া লইতে হয়। সাজাইয়া না বলিলে, হয়ত তুমি যাহাকে বলিতেছ, সে তোমার সকল কথা বুঝিতে পারিবে না, নয়ত সে কথাগুলি গ্রাহ্য করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে।

রচনা অতি সহজ। মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে সকল কাজই অভ্যাসাধীন। মৌখিক রচনায় সকলেরই অভ্যাস আছে। লিখিত রচনায় যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইবে। সেই অভ্যাস করাইবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় লিখিলাম।

আর মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একটু প্রভেদ এই আছে যে, লিখিত রচনার কতকগুলি নিয়ম আছে; সে নিয়মগুলি মৌখিক রচনায় বড় মানা যায় না—না মানিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু লিখিত রচনায় না মানিলেই নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই নিয়মগুলি বুঝাইব। তৃতীয় অধ্যায়ে পত্ররচনা শিখাইব।

---

# প্রথম অধ্যায়

——*——

## রচনা অভ্যাস

### প্রথম পাঠ

রাম খাইতেছে। পাখী উড়িতেছে। হরি পীড়িত হইয়াছে। মানুষ মরিয়া যায়। এইগুলিকে এক একটি বাক্য, উক্তি, বা পদ বলা যায়।

"রাম খাইতেছে"—এই বাক্যে কাহার কথা বলা যাইতেছে? রামের কথা। অতএব রাম এই বাক্যের "বিষয়"।

"পাখী উড়িতেছে"—কাহার কথা বলিতেছি? পাখীর কথা। "হরি পীড়িত হইয়াছে"—কাহার কথা বলিতেছি? হরির কথা। "মানুষ মরিয়া যায়"—কাহার কথা বলিতেছি? মানুষের কথা। পাখী, হরি, মানুষ, ইহারা ঐ ঐ বাক্যের বিষয়।

"রাম খাইতেছে"—এখানে রামের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু রামের কি কথা বলিতেছি? সে "খাইতেছে"—তাহার খাবার কথা বলিতেছি। "খাইতেছে" হইল বক্তব্য।

"পাখী উড়িতেছে।" "উড়িতেছে" বক্তব্য। "যদু পীড়িত হইয়াছে।" পীড়া এখানে বক্তব্য। "মানুষ মরিয়া যায়।" মরা এখানে বক্তব্য।

অতএব সকল বাক্যে দুইটি বস্তু থাকে; একটি "বিষয়" আর একটি "বক্তব্য"।

এই দুইটিই না থাকিলে বাক্য বলা সম্পূর্ণ হয় না। শুধু "গোরু" বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, আমার বলিবার কথা কি। কিন্তু "গোরু চরিতেছে" বলিতেই তুমি বুঝিতে পারিলে। বাক্য সম্পূর্ণ হইল। শুধু "ভাসিতেছে" বলিলে তুমি বুঝিতে পার না যে, আমার বলিবার ইচ্ছা কি। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কি ভাসিতেছে? কিন্তু যদি বলি যে, "কুম্ভীর ভাসিতেছে" বা "নৌকা ভাসিতেছে," বাক্য সম্পূর্ণ হইল—তুমি বুঝিতে পারিলে।

### অভ্যাসার্থ

১। নীচের লিখিত বিষয়গুলি লইয়া, তাহাতে বক্তব্য যোগ কর।

ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, বালক, মাতা, শিক্ষক, পুস্তক, ঈশ্বর, বৃক্ষ, ঠক, ঘট, প্রাণ।

২। নীচের লিখিত বক্তব্য লইয়া তাহাতে বিষয় যোগ কর।

হাসিল। ভাঙ্গিয়া গেল। উচিত নয়। বাড়িয়াছে। অধীন ছিল। ডুবিয়াছিল। প্রকাশ হইল।

---

## দ্বিতীয় পাঠ

কখন কখন বিষয়ের কোন গুণ কি দোষ আগে লিখিয়া তার পর বক্তব্য লিখিতে হয়। যেমন "সুন্দর পাখী উড়িতেছে।" "দুঃখী হরি পীড়িত হইয়াছে।" এখানে, পাখীটির একটি গুণ যে, সে সুন্দর; ইহা বলা হইল। হরির একটি দোষ যে, সে দুঃখী; ইহা বলা হইল। এগুলিকে বিশেষণ বলে। "সুন্দর" "দুঃখী" এই দুটি বিশেষণ। যাহার বিশেষণ, তাহাকে বিশেষ্য বলে। "পাখী" "হরি" ইহারা বিশেষ্য।

বিশেষণ উপযুক্ত হইতে পারে, অনুপযুক্তও হইতে পারে। উপযুক্ত বিশেষণ, যেমন—

ফলবান্ বৃক্ষ।<br>
বলবান্ মনুষ্য।<br>
নির্ম্মল আকাশ।<br>
বেগবতী নদী।

অনুপযুক্ত বিশেষণ, যেমন,—

নির্ম্মল বৃক্ষ।<br>
ফলবান্ মনুষ্য।<br>
বেগবান্ আকাশ।

এইগুলি অনুপযুক্ত। বৃক্ষের সমলতা বা নির্ম্মলতা নাই, এই জন্য নির্ম্মল বৃক্ষ বলা যায় না। মানুষে কোন ফল ফলে না, এই জন্য ফলবান্ মনুষ্য বলা যায় না। আকাশের বেগ নাই, এজন্য বেগবান্ আকাশ বলা যায় না। যে বিশেষণ উপযুক্ত, তাহাই লিখিবে, যাহা অনুপযুক্ত, তাহা লিখিও না।

## অভ্যাসার্থ

৩। নীচের লিখিত বিশেষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ কর।

সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তী, বন, সংসার, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বালিকা, দেশ, রাত্রি, আসন, পুতুল, হংস।

৪। নীচের লিখিত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর।

নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য, গুণবতী, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পরিষ্কার, অজ্ঞাত।

---

## তৃতীয় পাঠ

"ফলবান্ বৃক্ষ," "বলবান্ পুরুষ," "নির্ম্মল আকাশ," "বেগবতী নদী" বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হইল না। "ফলবান্ বৃক্ষ" সম্বন্ধে কি বলিতেছ? "বলবান্ পুরুষ" সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? এখানে "ফলবান্ বৃক্ষ," "বলবান্ পুরুষ" বিষয়; কিন্তু বক্তব্য কই? বক্তব্য লিখিলে তবে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে। যেমন—

ফলবান্ বৃক্ষ কাটিও না।
বলবান্ পুরুষ সাহসী হয়।
নির্ম্মল আকাশ দেখিতে সুন্দর।
বেগবতী নদী বহিতেছে।

### অভ্যাসার্থ

৫। নীচের লিখিত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর।

দয়াময় ভগবান্।
অবোধ শিশু।
স্নেহময়ী মাতা।
অন্নহীন ভিক্ষুক।
নিষ্ফল কার্য্য।
সহজ কাজ।
অন্ধকার রাত্রি।
স্বচ্ছ সরোবর।
মজবুত বাঁশ।
পাকা আটচালা।

"ফলবান্ বৃক্ষ," "বলবান্ পুরুষ" বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যদি বলি "বৃক্ষ ফলবান্," "মনুষ্য বলবান্," তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার কারণ সহজে বুঝিতে পারিবে। "ফলবান্ বৃক্ষ" বলিলে, "ফলবান্ বৃক্ষ"ই বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু "বৃক্ষ ফলবান্" বলিলে বৃক্ষ বিষয় হইল—ফলবত্তা তাহার বক্তব্য। "বৃক্ষ ফলবান্" এ কথায় এই বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। "মানুষ বলবান্" বলিলে বুঝাইবে, "মানুষের বল আছে।"

দেখ, দুই রকমে এক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। যথা—

বৃক্ষ ফলবান্।
বৃক্ষে ফল হয়।

মনুষ্য বলবান্।
মানুষের বল আছে।

আকাশ নির্ম্মল।
আকাশের নির্ম্মলতা আছে।
আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে।

নদী বেগবতী।
নদীর বেগ আছে।

"আছে" "হয়" "হইয়াছে" এইগুলিকে ক্রিয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বুঝায়, কিম্বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বলে। ধরিল, থাকিল, যাইল, শয়ন করিল, ভক্ষণ করিল, নিবেদন করিল—এ সব ক্রিয়া।

অতএব বক্তব্য দুই প্রকারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেষণ দ্বারা, যেমন "বৃক্ষ ফলবান্"; আর এক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা, যেমন—"বৃক্ষে ফল হয়।"

## অভ্যাসার্থ

৬। নীচের লিখিত বাক্যগুলির বক্তব্য বিশেষণের দ্বারা বল।

বাঙ্গালির বুদ্ধি আছে।
ইংরেজের বিদ্যা আছে।
মৎস্যে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়।
সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে।
বসন্তের বাতাস আস্তে বয়।
জলে ভিজিলে পীড়া হয়।

৭। নীচের লিখিত বাক্যগুলিতে বক্তব্য ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ কর।

পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান।
সূর্য্যকিরণ অসহ্য।
ব্যাঘ্র মাংসাশী।

তাহার স্বর গম্ভীর।

মাতাল চিরদুঃখী।

---

### চতুর্থ পাঠ

বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন—

অতিশয় ভারী।

প্রচণ্ড তেজস্বী।

প্রগাঢ় অন্ধকার।

ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায়; যথা—

অতিশয় ভারী লোহা।

প্রচণ্ড তেজস্বী অগ্নি।

প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রি।

অথবা,

লোহা অতিশয় ভারী।

সূর্য্য প্রচণ্ড তেজস্বী।

বর্ষার রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার।

আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন—

মৃদু হাসিতেছে।

শীঘ্র যাইতেছে।

দারুণ জ্বলিতেছে।

ভালরূপে মেরামত করিতেছে।

---

### পঞ্চম পাঠ

এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাক্য রচনা করিতে শিখ।

একটা বিষয় লও। "রাক্ষস"। বক্তব্য—তাহার বিনাশ। বাক্য এইরূপে লিখিতে হইবে।

"রাক্ষস বিনষ্ট হইল।"

এখন বিশেষণ যোগ কর। প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ।

"পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।"

তার পর ক্রিয়ার বিশেষণ লেখ।

"পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।"

তার পর ইচ্ছা করিলে, "পাপিষ্ঠে" বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার।

"চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।"

## পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগপূর্ব্বক বাক্য রচনা কর।

| বিষয় | বক্তব্য |
| --- | --- |
| পুত্র | পিতামাতার উপকার করা। |
| রাজা | প্রজাপালন করা। |
| স্ত্রী | স্বামীর সেবা করা। |
| বিদ্যা | অভ্যাসের অধীন। |

---

### ষষ্ঠ পাঠ

কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। "চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু আকাঙ্ক্ষা রহিল। কর্ম্ম আছে, কিন্তু কর্ত্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমরা জানিতেছি; কিন্তু কে তাহাদের বিনষ্টকারী, তাহা জানিতে পারিতেছি না। অতএব আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। যথা :—

"বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।" আবার বানরের বিশেষণ দিতে পার, যথা :—

"দুর্দ্দান্ত বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।"

আবার দুর্দ্দান্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়।

কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন—

"যদি আমি সেখানে যাই।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে।"

এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে,

"যদি আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিবে।"

## পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর।

হাতীর গায়ে যে বল আছে,

রামধন এমন দাম্ভিক,

রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে,

সাঁতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়,

যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ করিবে না,

তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর,

---

## সপ্তম পাঠ

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে শিখিয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য রচনা করিতে অভ্যাস কর।

একটি বিষয় লও, যথা—অশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ। যথা ঃ—

"অশ্ব চতুষ্পদ। অশ্ব বড় দ্রুতগামী। মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।"

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা—১। চতুষ্পদত্ব। ২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তদুপরি আরোহণ। এই জন্য তিনটি পৃথক্ বাক্য হইল। এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল।

আর একটি বিষয় লও "পৃথিবী"।

"পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে সংবেষ্টন করে।"

## পরীক্ষার্থ

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

---

## অষ্টম পাঠ

অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লিখিবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি যুক্তি বলিয়া দিতেছি।

১। প্রথমে বিষয়টি কি, তাহা বর্ণন করিবে।

২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহা বুঝাইবে।

৩। তাহার দোষগুণের বা কার্য্যের বিচার করিবে।

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার বিচার করিবে।

অশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতেছি।

### ১। বর্ণনা

অশ্ব চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ।

### ২। জাতিভেদ

অশ্ব অনেক জাতীয় আছে—যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী, ওয়েলর, টাট্টু ইত্যাদি।

### ৩। গুণ দোষ বিচার

অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান্ ও দ্রুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে মনুষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়।

### ৪। উপকার

মনুষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যথেচ্ছা ভ্রমণ করে। যে পথ অনেক বিলম্বে যাইতে হইত, অথবা শ্রমাধিক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না, অশ্বের সাহায্যে তাহা অল্প সময়ে যাওয়া যায়। মনুষ্য গাড়ি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অশ্বযোজন করিয়া, সুখে আসীন হইয়া বিচরণ করে। যুদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের দ্বারা ভারবহন ও হলাকর্ষণ কার্য্যও নির্ব্বাহ হয়।

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংক্ষিপ্ত। ইচ্ছা করিলে ইহার সম্প্রসারণ করিতে পার। যথা, বর্ণনায়—"অশ্ব চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ" লেখা গিয়াছে। কিন্তু চতুষ্পদ

জন্তু, কেহ মাংসাহারী, কেহ উদ্ভিজ্জাহারী, কেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব ইহার কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা লেখা উচিত। যথা—

"অশ্ব উদ্ভিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।" কিন্তু আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা কেবল উদ্ভিজ্জ খায়। যথা, গোমহিষাদি। অতএব আরও বিশেষ করিয়া লিখিতে পার যে, "যে সকল চতুষ্পদ উদ্ভিজ্জাহারী, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির শৃঙ্গ আছে, কতকগুলির শৃঙ্গ নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে।"

এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায়।

এইরূপে (২) জাতিভেদ, (৩) দোষ-গুণ, (৪) উপকার—এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়।

## পরীক্ষার্থ।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ।

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে ঐরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কখন কোনটি ছাড়িয়া দিতে হয়। যথা, চন্দ্র সূর্য্যের জাতিভেদ নাই—উহা ছাড়িয়া দিবে; তবে চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা লিখিবে। আর এই চারিটি ভাগ ছাড়া আর যাহা কিছু বক্তব্য লিখিতে চাও, তাহাতে আপত্তি নাই। বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের মত সঙ্কলন করা প্রথা আছে; আবশ্যক মতে তাহা করিতে পার। ভাল বুঝিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে পার।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রথম পাঠ—বিশুদ্ধি।

রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম (১) বিশুদ্ধি, (২) অর্থব্যক্তি, (৩) প্রাঞ্জলতা, (৪) অলঙ্কার।

প্রথমে বিশুদ্ধি। রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান গুণ।

যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অশুদ্ধ। কি হইলে রচনা অশুদ্ধ হয়, তাহা বুঝিলেই, বিশুদ্ধি কি, তাহা বুঝিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরূপ ; তবে কিছু প্রভেদ আছে। লিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়। অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লিখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধ হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন লিখিতেছি।

১। বর্ণাশুদ্ধি। মুখে সকলেই বলে, "পষ্ট" "মেগ" "শপত" "শট" "বাঁদ" "তুর্ব্বল" "নেত্য" কিন্তু লিখিতে হইবে "স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ, তুর্ব্বল, নৃত্য।"

২। সংক্ষিপ্তি। মুখে বলি, "কোরে" "কচ্চি" "কর্‌ব" "কল্লুম" "কচ্ছিলুম," কিন্তু লিখিতে হইবে, "করিয়া" "করিতেছি" "করিব" "করিলাম" "করিতেছিলাম" ইত্যাদি।

৩। প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, "কল্লুম," কোন প্রদেশে "কল্লেম," কোথাও "কল্লাম," কোথাও "কন্নু"। কোন প্রদেশবিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না ;—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে "ছড়ি," কোন দেশে বলে "নড়ি"। "ছড়ি" কলিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। "লগি" "লগা" "চৈড়"—ইহার মধ্যে লগিই কলিকাতায় চলিত, উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর তুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না।

৪। গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। "কৌশল্যার পো রাম," "দশরথের বেটা লক্ষ্মণ," এ সকল বাক্য গ্রাম্যতা-দোষে তুষ্ট।

নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন লিখিত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি দোষ অর্থাৎ বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিপ্তি, প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেন না, মৌখিক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি। কথোপকথন মৌখিক রচনা মাত্র। কবিতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৫। ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি এখানে লেখা যাইতে পারে না—তাহা হইলে এইখানে একখানি ব্যাকরণের গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ তুই একটা সাধারণ নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

সন্ধি। সংস্কৃতের নিয়ম, সন্ধির যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাকিলে সকল স্থানেই সন্ধি হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালার সমাস ব্যতীত সন্ধি হয় না। যে দুইটি শব্দে সমাস হয় না, সে দুইটি শব্দে সন্ধিও হইবে না।

সহজ উদাহরণ ;—"সঃ অস্তি," সংস্কৃতে "সোঽস্তি" হইবে ; কিন্তু বাঙ্গালায় "তিনি আছেন" "তিন্যাছেন" হইবে না। "অঙ্গুলি" "উত্থিত" এই দুইটি শব্দ সংস্কৃতে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মধ্যে আর কিছু না থাকিলে, "অঙ্গুল্যুত্থিত" হইয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গালায় যদি বলি, "তিনি অঙ্গুলি উত্থিত করিলেন," সে স্থলে "তিনি অঙ্গুল্যুত্থিত করিলেন," এরূপ কখনই লিখিতে পারিব না। কেন না, এখানে সমাস নাই।

বাঙ্গালায় সন্ধির দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্কৃতে কখন সন্ধি হইবে না। "আমার অঙ্গুলি" বলিতে হইবে, "আমারাঙ্গুলি" হয় না। সন্ধি করিতে হইলে, "মমাঙ্গুলি" বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয় না—কেন না, সমাস নাই। "মড়াহারী পক্ষী" বলা যায় না ; "শবাহারী" বলিতে হইবে। "গাধাকৃত পশু" বলা যায় না ; "গর্দ্দভাকৃত" বলিতে হইবে। সকলেই "মনান্তর" বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেন না, "মন" বাঙ্গালা শব্দ ; সংস্কৃত মনস্, প্রথমায় মনঃ, এ জন্য "মনোদুঃখ," "মনোরথ" শুদ্ধ।

তৃতীয় নিয়ম। যদি দুইটি শব্দই অসংস্কৃত হয়, তবে কখনই সন্ধি হইবে না। যথা, "পাকা আতা" সন্ধি হয় না।

সমাস। সমাসেরও নিয়ম ঐরূপ ; সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, "মহকুমাধ্যক্ষ" ; "উকীলাগ্রগণ্য" ; "মোক্তারাদি" এ সকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায়।

উভয় শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমাস করা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন। "অধরের অমৃত" বলিতে পার, অথবা "অধরামৃত" বলিতে পার। "অধরামৃত" বলিলে সমাস হইল, "অধরের অমৃত" বলিলে সমাস হইল না। সন্ধি করা না করাও লেখকের ইচ্ছাধীন। কেহ লেখেন "অধরামৃত," কেহ লেখেন "অধর অমৃত।"

বাঙ্গালায় সন্ধি সমাসের বাহুল্য ভাল নহে। সহজ রচনায় উহা যত কম হয়, তত ভাল।

প্রত্যয়। প্রত্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে নিয়ম, বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহারকালে সেই সকল বজায় রাখিতে হইবে। "সৌজন্যতা" "ঐক্যতা" এ সকল অশুদ্ধ। "সৌজন্য" "ঐক্য" এইরূপ হইবে।

সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। "মূর্খামি" বলা যায় না, কেন না "মূর্খ" সংস্কৃত শব্দ, "মি" সংস্কৃত প্রত্যয় নহে ; "মূর্খতা" বলিতে হইবে। "অহম্মুখ" সংস্কৃত শব্দ ; এজন্য "আহাম্মুখি" অশুদ্ধ, "অহম্মুখতা" বলিতে হইবে।

স্ত্রীত্ব। সংস্কৃতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্য যে লিঙ্গান্ত হইবে, বিশেষণও সেই লিঙ্গান্ত হইবে। যথা, সুন্দরী বালিকা, সুন্দর বালক ; বেগবান্ নদ, বেগবতী নদী।

বাঙ্গালায় এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সুন্দরী বালিকা লেখেন ; কিন্তু সুন্দর বালিকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ইহাতে কোন দোষই হয় না। যথা, এই বালিকাটি বড় সুন্দর। "রামের স্ত্রী বড় মুখর।" অনেক সময়ে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হইলে বড় কদর্য্য শুনায়। যথা, "রামের মা উত্তমা পাচিকা," এখানে "উত্তম পাচিকা" বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা রচনায় স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবল ;—

১। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে পুংলিঙ্গান্ত রাখিতে পার। যেমন সুন্দর বালিকা, উর্ব্বর ভূমি। কিন্তু পুংলিঙ্গান্ত বা ক্লীবলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে কখন স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে পার না। "পঞ্চমী দিবস" "মহতী কার্য্য" "সুবিস্তৃতা জনপদ" এ সকল অশুদ্ধ।

২। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রীলিঙ্গান্ত না করিলে, না করিতে পার ; কিন্তু যদি কতকগুলি বিশেষণ থাকে আর তাহার একটিকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত কর, তবে আর সকলগুলিকেও স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে হইবে। "সুন্দর বালিকা" বলিতে পার, কিন্তু "সুসজ্জিতা সুন্দর বালিকা" বলিতে পার না, "সুসজ্জিতা সুন্দরী বালিকা" বলিতে হইবে। "প্রখর নদী" বলিতে পার, কিন্তু "কূলপ্লাবিনী প্রখর নদী" বলিতে পার না ; এখানে "প্রখরা" বলিতে হইবে।

৩। বিশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয়, অসংস্কৃত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয় না। যথা "একটা বড় বাঘিনী" ভিন্ন "একটা বড়ী বাঘিনী" বলা যায় না ; "ঢেঙ্গা মেয়ে" ব্যতীত "ঢেঙ্গী মেয়ে" বলা যায় না। "ফুটা কৌড়ি," "ফুটী কৌড়ি" নহে। হিন্দীর নিয়ম বিপরীত। হিন্দীতে "ফুটী কৌড়ি" বলিতে হইবে।

৪। অসংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। "গর্ভবতী মেয়ে" না বলিয়া "গর্ভবতী কন্যা" বলাই ভাল। "সুশীলা বউ" না বলিয়া "সুশীল বউ" বা "সুশীলা বধূ" বলা উচিত। "মুখরা চাকরাণী" না বলিয়া "মুখরা দাসী" বলিব।

কারক। সকল বাক্যে কর্ত্তা ও কর্ম্ম যেন নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভুল সর্ব্বদা হয়। "আমাকে মারিয়াছে।" কে মারিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। "বুঝি দেশে রহিতে দিল না।" কে রহিতে দিল না, তাহার ঠিক নাই।

---

## দ্বিতীয় পাঠ

### অর্থব্যক্তি

তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোন আদালতের ইশ্‌তিহারের কথা লিখিতেছ। আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইশ্‌তিহার বলে। ইহার আর একটি নাম "বিজ্ঞাপন"। "বিজ্ঞাপন" সংস্কৃত শব্দ, ইশ্‌তিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য অনেকে "বিজ্ঞাপন" শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয় জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন, তাহার নাম "বিজ্ঞাপন"। দোকানদার আপনার জিনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম "বিজ্ঞাপন"। সভা, কি রাজকর্ম্মচারীর রিপোর্টের নাম "বিজ্ঞাপন"। "বিজ্ঞাপন" শব্দের এইরূপ অর্থের গোলযোগ আছে। এস্থলে, আমি ইশ্‌তিহার শব্দই ব্যবহার করিব। কেন না, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে, লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থেরও কোন গোল নাই।

দ্বিতীয় সঙ্কেত এই যে, যদি এমন কোন শব্দই না পাইলাম যে, তাহাতে আমার মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যেটি উহারই মধ্যে ভাল, সেইটি ব্যবহার করিব। ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ, "জাতি" শব্দ নানার্থ। প্রথম জাতি ( Caste ) অর্থে হিন্দুসমাজের জাতি ; যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয়, জাতি অর্থে দেশবিশেষের মনুষ্য ( Nation ) ; যেমন ইংরেজজাতি, ফরাসীজাতি, চীনজাতি। তৃতীয়, জাতি অর্থে মনুষ্যবংশ ( Race ) ; যেমন আর্য্যজাতি, সেমীয়জাতি, তুরাণীজাতি ইত্যাদি। চতুর্থ, জাতি অর্থে কোন দেশের মনুষ্যদিগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র ( Tribe ) ; যেমন, য়িহুদায় দশ জাতি ছিল। পঞ্চম, 'নানাজাতি পক্ষী,' 'কুক্কুরের জাতি' ( Species ) বলিলে যে অর্থ বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যে কোনও অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাঙ্গালায় অন্য শব্দ নাই। এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে

হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন্ অর্থে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া দিয়া, উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভাল হয়।

---

## তৃতীয় পাঠ

### প্রাঞ্জলতা

প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা। কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম, আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া দিতেছি।

১। একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হুতভুক্, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন্ নামটি ব্যবহার করিব? যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা অগ্নি। যদি বলি, "হুতভুক্ সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়," তবে অধিকাংশ বাঙ্গালী আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, "অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে" সকলেই বুঝিবে।

২। অনর্থক কতকগুলা সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না—অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি, "মীনক্ষোভাকুল কুবলয়"—তোমরা কেহ কি সহজে বুঝিবে? আর যদি বলি, "মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে," তবে কে না বুঝিবে?

৩। অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশী কথার প্রয়োজন কি? "এবম্বিধ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।" এরূপ না বলিয়া যদি বলি, "এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য্য উঠিল, তখন আমি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম," তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

৪। জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণে দেখ :—

"দিন দিন পল্লীগ্রাম সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে পল্লীগ্রাম যে জলহীন হইবে, এবং তদ্ধেতুক যে কৃষিকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ। "দিন দিন পল্লীগ্রাম সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম জলহীন হইবে। পল্লীগ্রাম সকল জলহীন হইলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাঁহারা ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

একটি বাক্যের স্থানে ছয়টি হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার আর কোন কষ্ট নাই।

৫। উদাহরণ। যেখানে স্থূল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়। এই গ্রন্থে সকল কথার উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং উদাহরণের আর পৃথক্ উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

৬। সম্প্রসারণ। স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিবে। অশ্বের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে দিয়াছি ; তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

"অশ্ব, শৃঙ্গহীন উদ্ভিদ্‌ভোজী চতুষ্পদ বিশেষ।"

ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা বুঝিবার কষ্ট, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে সম্প্রসারিত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ দেখ।

মনে কর, এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে "উন বর্ষায় দুনো শীত।" অর্থাৎ যে বার বৃষ্টি কম হয়, সে বার শীত বেশী হয়। মনে কর, তুমি সে কথা জান না। এমন অবস্থায় ভাদ্র মাসে তোমাকে যদি কেহ বলে, "এ বৎসর শীত বেশী হইবে," তাহা হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে করিবে। কিন্তু সে যদি নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, "যে যে বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, সেই সেই বৎসর বেশী শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, অতএব এ বৎসর বেশী শীত হইবে।" তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না।

ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে "অবয়ব" বলে। ন্যায়শাস্ত্রে অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, যথা—

"পর্ব্বতে আগুন লাগিয়াছে,
কেন না, পর্ব্বতে ধূঁয়া দেখিতেছি।"
যেখানে যেখানে ধূঁয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে।
এই পর্ব্বতে ধূঁয়া দেখা যাইতেছে,
অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে।
অনেক সময়ে এইরূপ লিখিলে রচনা বড় পরিষ্কার হয়।

---

### চতুর্থ পাঠ

#### অলঙ্কার

অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ বিধেয় নহে। অতএব অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু লেখা গেল না।

---

## তৃতীয় অধ্যায়

### পত্রলিপি

পত্র লিখিতে জানা, সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা অনেকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পত্র লিখিবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য পত্র লেখার পদ্ধতি বলিয়া দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিলাম। পত্র লেখা অতি সহজ। বাঙ্গালায় পত্র লেখার কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে।

পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাঁহাকে "সেবক" ও "প্রণাম" পাঠ লিখিতে হয়। যথা—

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং। এই "দেবশর্ম্মণঃ" শব্দ সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিবার আছে। ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপন নামের পর "শর্ম্মা" বা "দেবশর্ম্মা" লিখিতে বা বলিতে পারেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি

কেহ জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়ের নাম কি? তিনি উত্তর করিতে পারেন, "আমার নাম শ্রীরমানাথ শর্ম্মা" অথবা "শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা।" কিন্তু দেখিবে, পত্রের পাঠে লিখিত হইল "দেবশর্ম্মণঃ"—"দেবশর্ম্মা" নহে। ইহার কারণ এই যে, আসল শব্দটি "শর্ম্মণ্"। প্রথমায় ইহা শর্ম্মা হয়—"শর্ম্মণঃ" ষষ্ঠ্যন্ত। শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব "শর্ম্মণঃ" কি "দেবশর্ম্মণঃ" বলিলে "শর্ম্মার" ও "দেবশর্ম্মার" বুঝায়। উপরে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, "আপনার সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মার শতসহস্র প্রণাম ও নিবেদন।" ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের নামটি ঐরূপ ষষ্ঠ্যন্ত হইবে, যথা—

"সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং"।

"সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্তস্য প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

"সেবক শ্রীরামনিধি দাস বসোঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণকন্যারা সকলেই আপনার নামের পর "দেবী" লিখিতে পারেন, শূদ্র-কন্যাদিগকে "দাসী" লিখিতে হয়। "দেবী" শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে "দেব্যাঃ" হয়; "দাসী" শব্দ "দাস্যাঃ" হয়। এজন্য মোক্ষদা দেবী, কি কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী পত্র লিখিতে গেলে পাঠ লিখিবে,—

"মোক্ষদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি, "কৃষ্ণপ্রিয়া দাস্যাঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদ পত্রের ভিতরে লিখিতে হয় বলিয়া এ দেশের লৌকিক আচারে একটা ঘোরতর ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের নামই বুঝি "দেব্যাঃ" ও "দাস্যাঃ"। সাধারণ লেখকেরা, কর্ত্তৃকারকেও "দেব্যাঃ" লেখেন, কর্ম্মকারকেও "দেব্যাঃ" লেখেন, অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, সর্ব্বত্রই "দেব্যাঃ" ও "দাস্যাঃ"। ইহা বড় ভুল। "দেব্যাঃ" অর্থ "দেবীর"; "দাস্যাঃ" অর্থ "দাসীর"। সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা লেখায় উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। পত্রের পাঠ সংস্কৃত, এই জন্য সে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতেও সম্বন্ধ না বুঝাইলে ব্যবহৃত হইবে না।

সেইরূপ, "দেবশর্ম্মণঃ"। আজিও এমন অনেক মূর্খ ব্রাহ্মণকুমার আছে যে, নাম বলিতে গেলে বলে, "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ।" ইহা ভুল। ইহার অর্থ "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মার।" নাম বলিতে হইবে, "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা।"

এখন সেই "সেবক" পাঠ পুনর্ব্বার পড়িয়া দেখ—

"সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ

প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং"—এখন তোমার বিশেষ নিবেদন কি, তাহা সহজ বাঙ্গালায় লিখিবে, যথা—

"মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য্য করিলাম। আপনি যেরূপ লেখা পড়া ও আহারাদির নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, আমি সেই নিয়মানুসারেই চলিব। আমি জ্বরে কিছু কষ্ট পাইতেছি। চিকিৎসা করাইতেছি। ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।"

এই "ইতি" শব্দের অন্বয়, উপরে যে "নিবেদনঞ্চ বিশেষং"—লিখিয়াছ, তাহার সঙ্গে। "নিবেদনঞ্চ বিশেষং ইতি," অর্থাৎ "এই আমার বিশেষ নিবেদন।"

উপরে লেখকের নাম আছে, পত্রের নীচে আর তোমার নাম লিখিতে হইবে না। কিন্তু অনেকে শেষে নাম লেখেন। তাঁহারা সেবক পাঠ উপরে না লিখিয়া নীচে লেখেন। যথা—

"প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং—

মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া" ইত্যাদি লিখিয়া শেষে লেখেন, "ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ।"

উপরে "নিবেদনং" পদ আছে, এজন্য "দেবশর্ম্মণঃ" লেখা হইল, "দেবশর্ম্মার নিবেদন" বুঝাইল। নহিলে "দেবশর্ম্মা" লিখিতে হইত।

এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পত্র মুড়িয়া তাহার উপরে শিরোনাম লিখিতে হইবে। যেমন পত্রের পাঠ আছে, তেমনই শিরোনামেরও পাঠ আছে। পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে সেবক পাঠ লিখিতে হয়, তাঁহাকে শিরোনামে "পরমপূজনীয়" লিখিতে হয়। নামের পর "শ্রীচরণেষু" বা "শ্রীচরণকমলেষু" কি এইরূপ অন্য কোন সম্মানসূচক পদ লিখিতে হয়। যথা

"পরমপূজনীয়,

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষাল

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।"

নীচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথা—দেয়, ( বা দেনা ) মোং বর্দ্ধমান।

পূজ্য ব্যক্তিকে "প্রণাম" করিতে হয়, তুল্য ব্যক্তিকে "নমস্কার" করিতে হয়। এই জন্য তুল্য ব্যক্তিকে যে পত্র লেখা যায়, তাহার পাঠের নাম "নমস্কার" পাঠ। যথা—

"সবিনয় নমস্কারাঃ নিবেদনঞ্চ বিশেষং" অথবা বাঙ্গালায়—

"বিনয় পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদন।" অনেকে সংক্ষেপ করিয়া শুধু লেখেন—

"নমস্কার নিবেদন।"

আগে রীতি ছিল, লেখকের নাম পত্রের প্রথমে থাকিত, যথা—

"আজ্ঞাকারী শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ"। কিন্তু এখন "সেবক" পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধতি প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে লেখা হয়।

শিরোনামে পূর্ব্বরীত্যনুসারে, "মদেকসদয়" বা "পোষ্টৃবর" কি এমনই একটি ঘনিষ্ঠতাসূচক পদ ব্যবহৃত হইত। এখন, সে সকল পদ তত ব্যবহৃত হয় না। "মান্যবর" কি "বিজ্ঞবর" কি এমনই অপর কোন নিঃসম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"মান্যবর
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মিত্র
মহাশয় সমীপেষু।"

তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "শ্রীযুক্ত বাবু" শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় না। কেবল অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে লিখিতে "বাবু" শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। স্ত্রীলোককে লিখিতে গেলে, সধবা বা কুমারীকে "শ্রীমতী" লিখিতে হয়। যথা—

"পরমপূজনীয়া
শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী
মাতুলানী মহাশয়া শ্রীচরণকমলেষু।"

বিধবাকে "শ্রীযুক্তা" লেখা যায়।

মুসলমানকেও বাবু লেখা নিষিদ্ধ। মুসলমানকে "মৌলবী" বা "মুন্সী" লিখিতে হয়। নামের পর "সাহেব" লিখিতে হয়। যথা—

"মান্যবর
শ্রীযুক্ত মৌলবী লতাফাৎ হোসেন খাঁ
সাহেব বরাবরেষু।"

যাঁহাদের কোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি, তাঁহাদের সে উপাধি শিরোনামে লিখিতে হইবে। যথা—

"মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি
মহাতাপচন্দ বাহাদুর
প্রজাপালকবরেষু।"

"মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল সর্ আশ্লী ইডেন্, K. C. S. I.
বরাবরেষু।"

তার পর, যাহারা সম্বন্ধে ছোট, তাহাদিগকে "আশীর্ব্বাদ" পাঠ লেখা যায়। আশীর্ব্বাদ পাঠ অনেক প্রকার আছে, যথা—

"পরমশুভাশীর্ব্বাদ" ইত্যাদি

"শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু।"

কিন্তু অনেকেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। আত্মীয় ব্যক্তি হইলে, তাঁহারা "প্রিয়তমেষু" "প্রিয়বরেষু" এইরূপ লেখেন; বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু "কল্যাণবরেষু" লিখিয়া থাকেন। শিরোনামে, "পরমকল্যাণীয়" বা "কল্যাণীয়া" পাঠ লিখিতে হয়। শেষে কিছু আশীর্ব্বাদ বাক্য থাকা চাই। সকল স্থলে "শ্রীযুক্ত" পরিবর্ত্তে "শ্রীমান্" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"পরমকল্যাণীয়
শ্রীমান্ বাবু রাধানাথ দাস
বাবাজীউ চিরজীবেষু।"

"কল্যাণীয়
শ্রীমান্ নিশিকান্ত ঘোষ
ভাইজীউ মঙ্গলাস্পদেষু।"

শূদ্রকে পত্র লিখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শূদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন অনেক শূদ্র ইহা মানেন না।

স্থূল কথা, এখন অনেক ইংরাজি পত্র লেখার প্রথানুসারে লিখিতে হয়। তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইব।

১। "প্রিয়বর,

তোমার পত্র পাইলাম। যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহা সাবধানে খরচ করিও। তোমার বিষয়কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে সবিশেষ লিখিও। শারীরিক কুশলবার্ত্তা লিখিতে ত্রুটি করিও না। ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল, ৭ই মার্চ।

নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীরাধানাথ ঘোষ।"

২। "পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বিদ্যারত্ন
মহাশয় অশেষগুণালঙ্কৃতেষু।

পণ্ডিতবর,

আপনার প্রণীত নূতন গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি, আপনি নিত্য নূতন গ্রন্থ প্রচার পূর্ব্বক স্বদেশকে চরিতার্থ করিবেন; ইতি, তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ।

একান্ত বশংবদ
শ্রীহরিদাস দত্ত।"

# দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভূমিকায় দেবতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁহার একটি প্রবন্ধ রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে 'প্রচারে'র প্রথম দুই বৎসরের কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; সম্পূর্ণ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের কোনও নাম দেন নাই, বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বিষয় দৃষ্টে এই প্রবন্ধের 'হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্ব' এই নামকরণ করিয়াছি। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

# হিন্দুধর্ম্ম

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।*

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা, একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত, কি বর্ষা, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,—ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন! মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

---

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে-কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ-পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগপুষ্করিণ্যাদির জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।* যে হিন্দুধর্ম্মে তৃষিতকে এক গণ্ডূষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্ম্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসা-পীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র,—কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ

* ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারো পরিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায়, ১৯৬।

করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্ম্মে মন্বাদি অপেক্ষা মোল্‌ত্‌কে ও নেপোলিয়ন্ অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম্ম লুকাচুরি, তখন যেমন ধর্ম্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বিধিকে "রাজধর্ম্ম" ইত্যাদি বলা সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, মনুর কোন্ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম্ম আছে এবং কোন্‌গুলিতে নাই, এ কথার কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম্ম—যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যে দুর্জন, যে পিতামাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইতাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্ম্মে আজিকার দিনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই বা হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক, হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন

করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আর কোন নূতন ধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধর্ম্মহীন রাখা উচিত ? যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে ? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ; কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্‌লাম কতকগুলা বন্য জাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্ ধর্ম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব ? ব্রাহ্মধর্ম্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।

যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে ? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না—এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে ; তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কি সপক্ষ, কি বিপক্ষ, সকলেই

* অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই, যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমূলক।

স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়া ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেইটুকু সার-ভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম, তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক্ একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্টুকু ধর্ম্ম, কোন্টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্টুকু সার, কোন্টুকু অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে?

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫-২৩।

---

## বেদ

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ব্ব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ব্ব বেদ অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্দ্ধ যজুর্ব্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্ব্বেদ একখানি বই। ফলতঃ একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একওখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে,—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদি সহিত, মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এক উপনিষদ্ই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে

হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে। অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিধি রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বেদ যেরূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয় এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দুমতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামিত্যাদি"* কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটি সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক জন ঋষি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদ-সংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্ধৃত করিব। সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু ইহার একটি "হেডিং" আছে। আগে "হেডিং"টি উদ্ধৃত করি।

---

* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি।

"ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দ্দেবতা।
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।"

আগে এই "হেডিং"টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ "হেডিং" সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও ঐরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্, এই "হেডিং"টুকুর তাৎপর্য্য কি? ইহাতে চারিটি কথা আছে; প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?

প্রথম, ঋষিশব্দটুকু বোঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকির মত তপোবল-বিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম "নিরুক্ত"। নিরুক্ত একটি "বেদাঙ্গ"। যাস্ক, স্থৌলষ্ঠিবী, শাকপূণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্ত্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার ঋষি শব্দের অর্থ কি বলেন? নিরুক্তকার বলেন এই যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" অর্থাৎ যাহার কথা, সেই ঋষি।* অতএব যখন কোন সূক্তের পূর্ব্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটির বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্র রচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে।

---

* বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি-বাক্যকে সূক্ত বলে।

আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গড়িয়াছি, সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবল-বিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা অগ্নি। সূক্তের দেবতা কি? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল, তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় ঐরূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ, যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা "Subject," তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় ( Subject ), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, "যো দেবঃ সা দেবতা"—যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব ধাতু হইতে দেব। দিব দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল, তাহাই দেব হইল। পর্জ্জন্য—যিনি বৃষ্টি করেন, তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ ধাতুর পর র করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর র করিয়া অসুর হয়। ইন্দ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন, তাঁহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান্—বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন। বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

"ঋষির্মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।" ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না, ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতেও আছে। ঋক্‌গুলি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। "যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ।" অক্ষর-পরিমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়—পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত,—আমরা যাহাকে "হেডিং" বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাঁহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বকার কবিদিগের কাব্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত, যথা "গণেশ-বন্দনা"। তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা "ত্রিপদী ছন্দ" বা "পয়ার"। শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা "কাশীরাম দাস কহে," কি "কহে রায় গুণাকর।" ইংরাজিতেও দেবতা ও ঋষি লিখিত হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা, Alfred Tennyson ঋষি।

ঋষি, দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য সূক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, ঋষি (author), দেবতা (subject), ছন্দঃ (metre), বিনিয়োগ (use)।

এক্ষণে আমরা ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিতে পারি।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥"

'ঈলে' কি না স্তব করি। "অগ্নিমীলে" কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটিই আসল কথা। "অগ্নিং" কর্ম্ম, "ঈলে" ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সেগুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, অগ্নি অগ্ ধাতু হইতে হইয়াছে, "অগ কম্পনে।" বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, "অগ বক্রগতৌ।" কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটি পাওয়া যায়। "অগ্র" শব্দপূর্ব্বক "নী" ধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে "অগ্নি" শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে

যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটি পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, অগ্নি এই নাম অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা, Latin *ignis*, Slav *Ogni*। তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।—কাজেই যদি অগ্রপূর্ব্বক নী ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যদি অগ্রণী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান, এ কথাও উঠিল। বহ্বৃক্ মন্ত্রভাগে আছে—"অগ্নির্মুখং দেবতানাম্।" অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ"—দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, "অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না সেনাপতি।

তার পর এক রহস্য আছে।—আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্ত্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ, তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" অগ্নি দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমম্।

"অগ্নিমীলে"। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে। "পুরোহিতং"। অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইতেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জ্জনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

"যজ্ঞস্য দেবং"। অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বলিয়াছি—দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। "যজ্ঞস্য দেবং"—যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

ঋত্বিজং। ঋত্বিক্ বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন করিয়া ঋত্বিক্ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্য্যু, চারি জন উদ্গাতা, আর চারি জন ব্রহ্মা। যাহারা ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্য্যু। আর যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাঁহারা কার্য্য-পরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য অগ্নি হোতা। "ঋত্বিজং হোতারং"—সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্। ধাতমম্ ধারয়িতারম্। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নধাতম।

এই একটি ঋক্ সবিস্তারে বুঝাইলাম। এই সূক্তে এমন নয়টি ঋক্ আছে। অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

"অগ্নি পূর্ব্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বানকর্ত্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্ত্তা, এবং স্বগৃহে বর্দ্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)। ৮।

হে অগ্নে! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক। ৯।*

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; বুঝিবার চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল—তাও দ্বিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা বায়ু, ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে "মিত্রাবরুণৌ।" মিত্র কে, তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নাম মাত্রও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১—৩ ঋকের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম "অশ্বিনৌ"। ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র; ৭—৯ ঋকের দেবতা "বিশ্বেদেবাঃ।" আধুনিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০—১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

---

* মূল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম ঋক্ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবান্ এহ বক্ষতি। ২।
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমং। ৩।
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪।
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ। ৫।
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। ৬।
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি। ৭।
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮।
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে। ৯।

বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঋক্ লেখকের; অন্য ঋক্‌গুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত।

দ্বাদশের আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত "আপ্রী"সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রীসূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা—বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্গণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তদ্ভিন্ন দক্ষিণা ও সদসস্পতি বা নারাশংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। ঊনবিংশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর, তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইঁহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবিদাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্ত্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে ঋষি অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, "তিন একাদশ (১১×৩=৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস।" ঐরূপ ১।১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটি মাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত—

"এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।"

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋকে আছে, "ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কত ক্ষণ লাগে।*

তার পর জিজ্ঞাস্য, এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই, থাকিবার কথাও নয়। তবে শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ এইরূপ। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। "আদিত্য" "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতিবাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তার পর এ ছাড়া "দ্যাবাপৃথিবী" এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা

আদিত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস।

—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮।

## বেদের দেবতা

### ( বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ )

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বেদে কোন্ দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদসংহিতা বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই আমরা এখন ঋগ্বেদসংহিতার আলোচনায়

---

* তবু ঋষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই।

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ করিয়াছে। এই "তিন" পাঠক ছাড়িবেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের চরমে পৌঁছিতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে।

প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি ; কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিদিগের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে ( ইহাও বেদ ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা, ( ১ ) আদিত্য, ( ২ ) রুদ্র, ( ৩ ) বসু। তার পর মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

( ১ ) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, ইহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

( ২ ) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দেবতারাও ঋগ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অশ্বীদ্বয়, সোম।

( ৩ ) বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

( ৪ ) ত্রিত, আপ্ত্য, অহিব্রধ্ন ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

( ৫ ) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়—বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

( ৬ ) তদ্ভিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা—অদিতি ও ঊষা।

( ৭ ) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী গুঙ্গূ, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তদ্ভিন্ন পরিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, "দেব" ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে "আদিতেয়"

শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক, আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন আছে, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিতি, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; *The Infinite.*

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন; অদিতি অনন্ত, তাই অদিতি দেবমাতা; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেব-শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং ঔপধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি, তাহা এই ঃ—পৌরাণিকেরা বুঝিয়াছিল যে, এই অনন্ত,—অনন্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা—এই অদিতি; (*The infinite in time, space and existence*) ইহাই সর্ব্বপ্রসূতি। সর্ব্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান্, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্—আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ মরুৎ পর্জন্য, সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিতি দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতির এতটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিতি অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত, আকাশ অদিতি। তাই বেদে অদিতি কেবল সূর্য্যাদি আদিত্যদিগের মাতা। অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে;—যথা, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকে "যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষঃ দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ"—ইত্যাদি।

এখানে অদিতির বিশেষণ "দ্যৌঃ" শব্দ। দ্যৌঃ শব্দে আকাশ।*

অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী, ইহা বলিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, ইনি আকাশ মাত্র। ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা হয়,

---

* শতপথব্রাহ্মণে আছে, "ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ." এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনন্তার্থে। অথর্ব্ব বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, "ভূমির্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম্।" এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ।

(১) আকাশ, যথা, অদিতি, দ্যৌস্, বরুণ ( ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন ), ইন্দ্র, পর্জ্জন্য।

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।

(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।

(৪) নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, ঊষা, অশ্বীদ্বয়।

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা বায়ু, মরুদ্‌গণ।

(৬) নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা।

(৭) ত্বষ্টা, যম, প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮।

## ইন্দ্র

এখন আমরা কতক কতক জানিয়াছি, ঋগ্বেদে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা আছে। আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সবিশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন ইন্দ্রাদির কথা বলি।

এই ইন্দ্রাদি কে? ইন্দ্র বলিয়া যে এক জন দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বলিয়া দেবতা এক জন আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য কি তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছে? তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দু বলিবেন যে, "হাঁ, অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে ঋষিরা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।" বোধ হয়, আমাদিগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ সকল কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চোর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দন-কাননে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী,—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্ত্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্ত্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্ত্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদ্‌গ্রস্ত, সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেব-চরিত্র?

ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্য-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি ? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গূঢ় তাৎপর্য্য আছে ; তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর। সেই কথাটি ক্রমে পরিস্ফুট করিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি। সেই কথা বুঝিবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে পাইলাম।

অনেকে বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন ? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদিগকে কোথা হইতে জানিলেন ? পাকা হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন—বেদ ত অপৌরুষেয় ! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে ঋষি-প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এ কথায় যাঁহারা বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই।

বেদ যদি ঋষি-প্রণীত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, ঋষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঋগ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর পৌঁছিল কোথা হইতে ? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা বুঝিলেই সে কথাটাও বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে।

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে ? কে নাম রাখিল ? মনুষ্যে, না তাঁর বাপ মায়ে ? "তাঁর বাপ মায়ে," এমন কথা বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা ঋগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বড় গোলযোগ। ঋগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। ঋগ্বেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত্ত্ব এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি অদিতি ও কশ্যপের পুত্র। পুরাণেতিহাসে তাঁহার এই পরিচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদিতি ও কশ্যপ—ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় কি তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন ?

আগে বুঝিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র অদিতি এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন ? অদিতি কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি—তিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা

বলিয়াছি, তাহার উপর তুই এক জন বিলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপূত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত উদ্ধৃত করিলাম।*

এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্যপের কিছু পরিচয় দিই। এখানে সাহেবদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম কূর্ম্ম। আবার কূর্ম্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, সে কচ্‌কচিতে আমাদের কাজ নাই—বৈদিক ঋষিরা তাহার দায়ী।—অতএব যে করিয়াছে, সেই কূর্ম্ম। কূর্ম্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্ত্তা আবার কশ্যপ হইল, কেন না—কূর্ম্ম কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত, তিনি কূর্ম্ম, তিনিই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

"স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপা ইতি।"—শতপথব্রাহ্মণ ৭।৪।১।৫

ইহার অর্থ—

"কূর্ম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে।—প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন ( অকরোৎ ), করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম। কশ্যপও ( অর্থাৎ কচ্ছপ ) কূর্ম্ম। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।"

---

* আচার্য্য রোথ বলেন—

"Aditi Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings of such are not wanting. ... This eternal and inviolable principle in which the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestial Light."

মুর সাহেব কৃতানুবাদ।

২। মাক্ষমূলর বলেন—

"Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the sky."

*Translations from the Rig-Veda, I. 230.*

সায়নাচার্য্যের মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তিনিও জানেন যে, অদিতি চৈতন্যযুক্তা দেবী-বিশেষ নহেন। তিনি বলেন, "অদিতিং অখণ্ডনীয়াং ভূমিং দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাং।" কেহ কেহ অদিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে ; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা*—পুরুষ আদি কারণ। যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় পাইলাম, তখন এরূপ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও বুঝি একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন—প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা, অদিতি ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময়ে রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা যাঁহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর "র" প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, অদিতিও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে।† বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে—থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি ; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র ; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দ্যৌঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব।

আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজ্রধর, আর কেহ কেন নহে। যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত করেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, কতকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই, কেন না, সংহিতা সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। নানা সময়ে, নানা ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত, না হয় দৃষ্ট

---

* পাঠকের স্মরণ থাকে যেন, প্রথমে অদিতি অনন্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন—প্রথমে অদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র। "অনন্ত" ইতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পৌঁছে।

† মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ "অদিতি" এবং আকাশ "ইন্দ্র" বলিয়া কল্পিত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ঋগ্বেদে তিনি অদিতির পুত্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই ; কেবল এক স্থানে মাত্র ইন্দ্র ঋগ্বেদে আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সে সূক্তটিও বোধ হয় আধুনিক।

মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মাত্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনটি পরবর্ত্তী অবশ্য হইবে। যে সূক্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যযুক্ত দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি ঋষিরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সূক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা ঋষিদের মনে আছে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

"অবর্দ্ধয়িন্দ্রম্মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা" ১০।৭৩।১

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাঁহাকে বাড়াইলেন। এ স্থলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

"ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতবো নিরেকে" ১০।১১২।৩

এখানে সূর্য্যালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে "হরিশিপ্র" "হরিকেশ" "হরিশ্মশ্রু" "হরিবর্পা" "হিরণ্যয়" "হিরণ্যবাহু" ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্য্যোলোকজনিত কাঞ্চনবর্ণ সূচিত হইতেছে। বর্ষণকালীন মেঘ সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন—"যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ" ১০।২২।৪।৬। ইন্দ্রের বজ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ" ৮।৭৯।৯। বজ্র অন্তঃসমুদ্রে জলকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরীক্ষের বায়বীয় পদার্থ। অথর্ব্ববেদে ইন্দ্রের জাল আছে—"অন্তরীক্ষম্ জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।" অথর্ব্ববেদ ৮।৫। অর্থাৎ অন্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পৃথিবীর দিক্ সকল জালের দণ্ড বা বাঁশ—এ জাল আকাশেরই।

এরূপ উদাহরণ খুঁজিলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। এ সকল উপন্যাস অধিকাংশ অসুরবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন যে, "অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে ইতি অসুরঃ।"

যদিও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, তথাপি শেষাবস্থায় দেবদ্বেষীদিগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ। যখন বেদে পড়ি যে, বৃত্র নমুচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিলেন, তখন অনেক স্থানেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্ন মাত্র, বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র। আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অমনি সে অসুরেরা মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে। "বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ," "বজ্রেণ যানি অতৃণৎ নদীনাং," "ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহীহাচ্ছ সমুদ্রং" এমন কথা অনেক

পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২ ঋকে আছে যে, "বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ"—বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদীসকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গো-সকল হাম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে, বৃত্রাদি অসুর বধ হইলেই জল ছোটে। অতএব অসুর-বধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্নসকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হিমেন অবিধ্যদর্ব্বুদং" ৮।৩২।২৬ ( হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি, তদ্দ্বারা )। শুষ্ক কালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (hail) পড়ে। পুনশ্চ "অপাম্ ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্ত্তয়ৎ" ৮।১৪।১৩, জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্ত্তন করিলেন। বড় বৃষ্টির চোটে অসুরটা মারা গেল।

অতএব নমুচি বৃত্র শম্বর অহি প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণেতিহাসের অনেক মালমসলা যোগাইয়াছে।

ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল কি প্রকারে রচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। কথিত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং ঋষির শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্রধা বিকৃত হয়। তাহার পর আবার ঋষিবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পরিণত হয়। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত্র লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অভক্তির কারণ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবেরাও—অন্যে নয়, মূর, মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভৃতি, পড়িয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন যে, লাম্পট্যপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তা-বশতঃই, ইন্দ্রাদি দেবতাকে লম্পট বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়? সাহেবেরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আমি নূতন গড়িতেছি না—অনেক সহস্র বৎসরের কথা। প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বলি, ইন্দ্র সহস্রাক্ষ; তাহারা বলে, আর্গস শতাক্ষ। *

* "Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it. . . . . For instance the Greeks had

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই জানেন—হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন, অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৃ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন। কুমারিল ভট্ট এ উপন্যাসের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা নোটে* উদ্ধৃত করিলাম। উপরিকথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী।

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে। বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোরু দাও, ভার্য্যা দাও, শত্রুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ-শক্তির বিকাশস্থল; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবী বৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জিনী

---

still present to their thought the meaning of Argos Panoptes, Io's hundred eyed-all seeing guard, who slain by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself, even as the Aryan Indra—the Sky—is the "thousand-eyed."

Tylor's *Primitive Culture*, p. 230, Vol. I.

* "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার। ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১—৪৬৮ পৃঃ।

বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান্, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান্ না হইব, তবে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি লইয়া কি করিব ? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, সে পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ ইন্দ্রিয়পরবশ, কুকর্ম্মশালী, স্বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। হিন্দু-ধর্ম্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে—হিন্দুধর্ম্মে যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ; যেখানে তাঁহার রূপ দেখিব, সেইখানে তাঁহার পূজা করিব। সেই অর্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা পুণ্যময়—নহিলে অধর্ম্ম।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ১৪৫-৫৬।

## কোন্ পথে যাইতেছি ?

যাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশ। তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য্য এই, এই কথা বলিলেই তাঁহাদের কাজ ফুরাইল। খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, য়ীহুদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোম্‌ত, ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ। ইহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না—কিসের উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে ? ধর্ম্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে ; যাঁহারা ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।

উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না।* ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি

---

* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।

আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি কথা একত্রিত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দুইটি উক্তি পরস্পর অসঙ্গত। হিন্দুধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ করে। কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরেরন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে কি প্রকারে ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্ম্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।

যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "হিন্দুধর্ম্ম তবে ধর্ম্মই নহে, মিথ্যা ধর্ম্ম।" আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও—বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।"

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্ম্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি ? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্ম্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব, আমি নবজীবনে বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি প্রচারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি নবজীবনে দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের তিন ভাগ, ( ১ ) তত্ত্বজ্ঞান, ( ২ ) উপাসনা, ( ৩ ) নীতি। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঐ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। ( ১ ) বৈদিক, ( ২ ) দার্শনিক, ( ৩ ) পৌরাণিক।

এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। ( ১ ) দেবতাতত্ত্ব, ( ২ ) ঈশ্বরতত্ত্ব, ( ৩ ) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায় ; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে ; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যার গোড়ায় ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন যে, কেন আমরা ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাদিগকে লইয়া প্রচারে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি।

পূর্ব্ব কয় সংখ্যার কয়টি বৈদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা করি, পাঠকদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে—দেবতা মোটে তেত্রিশটি। অনেক আধুনিক দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন আর প্রচলিত নাই।

(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি; নয় অন্য কোন নৈসর্গিক পদার্থ। তাঁহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বলি—সেরূপ দেবতা নহেন।

(৩) ঐ নৈসর্গিক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্ বা সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভক্তি, এবং চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা বিধেয়।

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি অদিতি ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতাগুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পরিচিত না করিলে, এই দেবতাতত্ত্ব প্রমাণীকৃত বা প্রাঞ্জল হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পাঠককে এত দূরে আনিয়া আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ২০০-২০৪।

## বরুণাদি*

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অদিতি, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ব্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইহার পূর্ব্বস্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু প্রাচীন কালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে, গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্ম্মে Ouranos আকাশ-দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট্ ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

আর এক আকাশ-দেবতা "দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের "Zeus" এবং "Zeus pater" হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। "দ্যৌঃ" এক কালে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্ত নাম "দ্যাবা-পৃথিবী।" দ্যৌঃ পিতা—পৃথিবী মাতা। ইহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইহারা যে আকাশ ও পৃথিবী, ইহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পর্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়েনিয়া বলিয়া রুষ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্য্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি, তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি, বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পর্জন্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখানেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্য্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, পর্জন্য তাঁহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবর্ষীয়

---

* যথা "যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ। অপ স্থক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ তে দেবাসো" ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১।

দেবতা। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক পরবর্ত্তী।

এক্ষণে সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্য্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্য্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই—তিনি কে, তা জানি। অন্য সৌর দেবতাদিগের পরিচয় দিতেছি। যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, ঊষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্য্যের সহিত কতকগুলি সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তার পর পূষার স্তুতি। তার পর অর্য্যমার স্তুতি। তার পর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্ত্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ঊষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল—ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল—অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।"

"যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।"

তার পর অর্য্যমা, অর্য্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন—

"পূষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল—ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়।"

"মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই "পশুপা" "পুষ্টিম্ভর" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ত্তিতে সূর্য্য কৃষিধনের রক্ষাকর্ত্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্য্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পথিকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; কেন না, তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের স্তুতি,—মিত্রাবরুণৌ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা

হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণৌ অব্রুবন্ ইদং নো বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং।" অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না—জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বলিলেন—তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১।৭।১০।১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে—স হি স্বগমনেন রাত্রিং জনয়তি।" "অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।" শতপথব্রাহ্মণে আছে, "অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।" অর্থাৎ ইহলোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র। সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্য্যজাতিমধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Uranos, তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজদ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে।—যথা সিন্ধু স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন সুরাসুর শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের কথার তাৎপর্য্য এই, অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেষী,* কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া "অসুর" হয়। অর্থাৎ আকাশে, সূর্য্যে, পর্ব্বতে, নদীতে, যাঁহাদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারাই অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলা হইয়াছে। এই অহুরমজ্‌দ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজ্‌দ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইঁহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিথ্র যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যেই মিথ্রদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আসিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বরাজ্যমধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা জানুন বা না জানুন, মানুন

* অসুতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে।

বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।*

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্য্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও সে উৎসব আছে—"মকরসংক্রান্তি"—যে দিন সূর্য্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার "মকরসংক্রান্তি," আর যে দিন সূর্য্যের মকরে যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়—মকরে প্রকৃত সঞ্চার, "মকরসংক্রান্তি" হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ "Precession of the Equinoxes." জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, এই আমাদের "মকরসংক্রান্তি" পৌষপার্ব্বণ ও সাহেবদিগের "খ্রীষ্টমাস" একই। কথাটা "আষাঢ়ে" রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০।

## সবিতা ও গায়ত্রী

আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর সূর্য্য-দেবতাদিগের কথা বলিতে-ছিলাম। সূর্য্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই—চেনা জিনিস। ভগ, অর্য্যমা, পূষা ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না—পৌরাণিক তত্ত্বের

* The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII. Kal. Jan.) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been instituted in this special form by Aurelian about A. D. 273, and to this festival the day owes its apposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, "Dies Natalis Solis Invicti." With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day was adopted in the Western church, where it appears to have been generally introduced in the fourth century, and whence in time it passed to the Eastern Church as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas Day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it. The real origin of the festival is clear from the writings of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and Gregory Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, of the new Sun.—Tylor's *Primitive Culture*, Vol. II, p. 297-8.

টইলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাঁহার ঐ নোটের লিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে।

আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল সবিতাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ। সূর্য্যের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন ( "তৎ সবিতুঃ" ), সেখানে তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎস্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের বিচার্য্য। পূষা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপ্রচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে পারি না—কেন না, তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ত্রীর দেবতা। গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন—তিনি কেবল একটা বৃহৎ জড়পিণ্ড, না সর্ব্বস্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর? আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিব। আমরা সবিতাকে সূর্য্য-দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে।

"সু" ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থ প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "সর্ব্বস্য প্রসবিতা।" সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যাকালে "তৎ সবিতুঃ" ইতি বাক্যের অর্থ করেন, "জগৎপ্রসবিতুঃ।" যদি তাই হয়, তাহা হইলে সবিতা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও "তৎ সবিতুঃ" শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে "প্রজাপতি" বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধী হইতে পারে না।* জল বায়ু তাঁহার আজ্ঞাকারী।† অন্য দেবতারা তাঁহার অনুযায়ী।‡ বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, অদিতি ও বসুগণ তাঁহার স্তুতি করেন।§ তিনি প্রার্থনার বস্তুর ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন। তিনি ভুবনের প্রজাপতি; আকাশের ধর্ত্তা ( দিবো ধর্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ।৫।৫৩।২। ) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

---

* নকিরস্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্য্যমন্ মিনন্তি রুদ্রাঃ। অস্যহি সর্ব্বশাস্তারং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনন্তি স্বরাজ্যং।২।৩৮।৭।৯।—৫।৮২।২।

† আপশ্চিদস্য ব্রতে আনিম্রগ্রা অয়ঞ্চিৎ বাতো রমতে পরিজ্মন্।২।৩৮।২।

‡ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদ্দয়ুর্দ্দেবাঃ।৫।৮১।৩।

§ অপি স্তুতঃ সবিতা দেবো অস্তয়ং আচিদ্বিশ্বেবসবো গৃণন্তি। অভি যং দেবী অদিতির্গণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা। অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি অভিমিত্রাসো অর্য্যমা সযোষাঃ।৭।৩৮।৩, ৪।

আছে যে, "প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত।" সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কথাগুলায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব্দ ঋগ্বেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে ( ৭।৬৩।২ )। ঋগ্বেদের সূক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা যায় না। সবিতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্য্যার্থে সবিতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ম, ১৪ সূ, ২ ঋকে।

২। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্য্যের মত তাঁহার কিরণ আছে ( প্রসুবন্নক্তুভির্জ্জগৎ ৪ ম, ৫৩ সূ, ৩ ঋক্ ), সূর্য্যের মত তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন।

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই সবিতার কাল।* সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি, সেই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, সেই সূর্য্য।† অতএব এই মত পূর্ব্বপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত।

৪। সবিতা যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক দেবতার ন্যায় সাকার। তিনি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যজিহ্ব, হিরণ্যপাণি, পৃথুপাণি, সুপাণি, সুজিহ্ব, মন্দ্রজিহ্ব, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে। ( বাহু, কর মাত্র ) ।

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা পরব্রহ্ম নহেন, জড়পিণ্ড সূর্য্য। তবে গায়ত্রীর সেই "তৎ সবিতুঃ" শব্দের অর্থ কি হইল ? এত কাল কি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীতে সূর্য্যকেই ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয় ? যে গায়ত্রী না জপিয়া ব্রাহ্মণকে জল গ্রহণ করিতে নাই, যে গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—সে কি কেবল জড়পিণ্ড সূর্য্যের কথা, জগদীশ্বরের নহে ?

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায়

---

* তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি।

† উদয়াৎ পূর্ব্বভাবী সবিতা। উদয়াস্তমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য ইতি।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করিলাম।* কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা? গায়ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝিলেই গোল মিটিতে পারে।

গায়ত্রী আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের একটি ঋক্। তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮টি ঋক্ আছে; তন্মধ্যে দশম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূক্তটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক "গায়ত্রী"র মর্ম্ম বুঝিবেন না।

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রাবরুণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে), বৃহস্পতি, পূষা, সবিতা, সোম, মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তের বক্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তুত হইয়াছেন। ঐ স্তুত দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। যে ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব।

সূক্তটি এই :—

"ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
ক্বত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১ ॥
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দ্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে ॥ ২ ॥
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্ম্মরুতঃ সর্ব্ববীরঃ।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥ ৪ ॥

* "গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"

শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং।
বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥
ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দ্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭ ॥
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব যোষণাং ॥ ৮ ॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥
দেবস্য সবিতুর্ব্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ॥
সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিষ্কৃতং।
ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥
অস্মাকমায়ুর্ব্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥ ১৬ ॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং।
পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

শেষ ৪ ঋকের ঋষি কোন কোন মতে জমদগ্নি। অস্যার্থ।

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান্ রিপুকর্ত্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে, যে যশঃদ্বারা সখিভূত আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও

বরুণ ! ধনেচ্ছু মহান্ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করেন। মরুদ্গণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই অভিলষিত বস্তু এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকরণে সামর্থ্যবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় দেবপত্নীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩। হে সর্ব্বদেবহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধন দান করুন। ৪। হে ঋত্বিক্গণ! বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি করিতেছি। ৫। মনুষ্যদিগের অভিমত ফলদাতা অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তিমন্ পূষন্! এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিতেছি। ৭। হে পূষন্, স্তুতিকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯। সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সহিত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন এবং পাপ নাশ করিয়া হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকর্ম্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধুররসবিশিষ্ট করুন। ১৬। বহুস্তুত এবং স্তুতিবৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপনারা দীর্ঘস্তুতিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি ঋষি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞবর্দ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮।

এখন দেখা যাইতেছে, যখন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একত্রেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, তখন সবিতা পরব্রহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবারই সম্ভাবনা। একাদশ ঋক্‌টিও সবিতৃস্তব। ঐ ঋকে সবিতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়েই সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ, ইহাই সম্ভব। পাঠক দেখিবেন, যে ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায় ( দশম ঋক্ ), তাহার পূর্ব্বে "ভূ" "ভুব" "স্বর্" এ তিনটি শব্দ নাই। গায়ত্রীর পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, অনেকে মনে করেন, "তৎসবিতা" অর্থে, এই ত্রৈলোক্যের প্রসবিতা।

এই ঋক্‌টির গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। আর ১৫টি গায়ত্রীচ্ছন্দে। এই ঋক্‌টির প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগৌরব হেতু। সত্য বটে যে, সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান ঋষিরা ব্রহ্মবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই করিলেন। এবং সেই অর্থ ই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত হইল।

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণেরই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে ঋষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থ ই অভিপ্রেত করিয়া থাকুক না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাঁহার বাক্যের সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থে ই গায়ত্রী সনাতন ধর্ম্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থ ই প্রচলিত থাকাই উচিত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, হিন্দুধর্ম্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান্ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ পৃথক্ বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফলে ভূষিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭।

## বৈদিক দেবতা

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা,—প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছুই দিবার নাই। সূর্য্যের ন্যায় বায়ু আমাদিগের কাছে নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্দ্রাদির ন্যায় ইনি একজন দিক্‌পাল-মধ্যে গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরিতে হয়।

মরুদ্গণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। নামটা কোথাও একবচন নাই; সর্ব্বত্রই বহুবচন। কথিত আছে যে, মরুদ্গণ

ত্রিগুণিত ষষ্টিসংখ্যক, এক শত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইঁহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্ ধাতু চীৎকারার্থে। রুদ্ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ্ ধাতুর পর সেই "র" প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুদ্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও বা মরুদ্গণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে।

তার পর অগ্নিদেবতা। অগ্নিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে, তাঁহারও কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াও হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাঁহাকে কখন বৃহস্পতি, কখন ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ইনি অগ্নি, কেহ কেহ বলেন ইনি ব্রহ্মণ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটি তারা। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি চন্দ্র নহেন। ঋগ্বেদে তিনি সোমরসের দেবতা।

অশ্বীদ্বয় পুরাণেতিহাসে অশ্বিনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে, তাঁহারা সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের পৌরাণিক নাম অশ্বিনীকুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, তাঁহারা শেষরাত্রির দেবতা; ঊষার পূর্ব্বগামী দেবতা।

আর একটি দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা যাহা, ঋগ্বেদে ত্বষ্টা তাহাই। অর্থাৎ দেবতাদিগের কারিগর।

যমও ঋগ্বেদে আছেন, কিন্তু যমও আমাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। যমদেবতার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে।

ত্রিত, আপ্ত্য, অজ, একপাদ প্রভৃতি দুই একটি ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে, তাঁহাদের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে।

বৈদিক দেবীদিগের মধ্যে অদিতি, পৃথিবী এবং ঊষা, এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অদিতি ও পৃথিবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। ঊষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; কেন না, যাহার ঘুম একটু সকালে ভাঙ্গিয়াছে, সে-ই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী, কখন বাগ্দেবী। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র বৈদিকদেবীদিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ করিয়া পাঠকদিগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যক্তিগত পরিচয়

সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। তার পর বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬৬-৬৮।

## দেবতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা নদী ; এইরূপ অচেতন জড় পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড় পদার্থের উপাসনা কেন ? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল ? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে ? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইঁহাদিগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত যোন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্য্যবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত বা অন্য কোন প্রকার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তর-বাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত। আমরা কতকগুলি উদাহরণ দিব। অধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে আমাদের দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদিগের তুষ্টির জন্য দুই এক বার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই ; কেন না, কোন হিন্দুই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিমবাসীদিগকে দেখিয়া আইসে নাই।

হইত এবং সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক রীতিমত প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিত। ফ্লোরিদার আদিমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারি বার সূর্য্যের উৎসব করিত। এ দেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মেক্সিকোনিবাসী অজতেকদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজার সেইরূপ ঘটা ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মিত সূর্য্যের বৃহৎ স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই সূর্য্যের ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্য্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ-আমেরিকার বোগোটানিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্য্যের নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্য্যোপাসনা অতি বিখ্যাত এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্য্যোপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজারা আমাদিগের রামচন্দ্রাদির ন্যায় সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যের প্রতিনিধি বলিয়া রাজ্য করিতেন। পিরুদেশে স্বর্ণখচিত অসংখ্য সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যের স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিসকল সর্ব্বলোকের দ্বারা উপাসিত হইত।

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল্ জাতিরা সূর্য্য উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ড, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবের নাম বুড়াপেন্নু। তিনি স্রষ্টা এবং বিধাতা। তদ্ভিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়াবাসীরা এবং লাপ জাতিরা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্য্যোপাসনার কথা বলিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্ প্রভৃতিও তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রাক প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যানসকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস—সূর্য্য-রূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন।

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সূর্য্যের নানা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্ত্তি রা আর এক মূর্ত্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্ত্তি হার্পক্রোতি*। প্রাচীন সিরীয় ও আসিরীয় ও টিরীয়দিগের মধ্যে সূর্য্য বালস্‌মেস্, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূর্য্যোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্য্যদেবের নাম এলোগবল্। তাঁহার পুরোহিত

---

* Harpokrates.

হেলিওগবলস্ রোমকের একজন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সূর্য্যোপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। যেখানে সূর্য্যোপাসনা লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খৃষ্টমস্ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পক্ষান্তরে বিডুইন আরবেরা মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্নিসূর্য্যের ন্যায় বায়ুরও উপাসনা বহু দেশে প্রচলিত। আলগঙ্কুইন জাতিদিগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান লংফেলো কৃত Hiawatha নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, এই চারিটি দেবতা চারি প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এবং মরুদ্‌গণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু, কোথাও মরুদ্‌গণ পূজিত। পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদ্‌গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিবু। বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্‌গণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, ঐ পূজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলেসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মৌই প্রধান দেবতা। তিনি কোন কোন স্থানে বায়ু-দেবতা বলিয়া পূজিত হন। টাহিটিতে তিনি পূর্ব্ব বায়ু। নবজিল্যাণ্ডে তিনি বায়ুগণের শাসনকর্ত্তা। ফিন্‌জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্কো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্, জেফিরস্ এবং ইয়লস্ বায়ু-দেবতা। হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওডিন মরুদ্দেবতা। এই মরুদ্দেবের পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্ত্তমান আছে। কারিন্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাষ্ঠপাত্র গাছে ঝুলাইয়া দিয়া বায়ুদেবকে ভোগ দেয়। জার্ম্মনির অন্তর্গত স্বাবিয়া, টাইরোল এবং উপরপালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে ঐরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যেও বরুণ এইরূপ দুই ভাগ হইয়াছেন। য়ুরেনস্ (Uranos) আকাশ-বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপচুন (Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ-বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বলি। পলিনেসিয়া প্রদেশে তুয়ারাতাই এবং রুয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দক্ষিণ-আমেরিকায়

পিরুবাসীরা মামাকোচা নামে সমুদ্রদেবের পূজা করে। পূর্ব্ব-আসিয়ায় কামচকট্‌কা প্রদেশে মিৎক্‌ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। স্থলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম মিধস্নোকামি এবং জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জেবিস্থ।

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটি বৈদিক দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিব। পরে যে তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০১-১০।

## দ্যাবাপৃথিবী

আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যৌঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। এই দ্যু বা দ্যৌ বেদে দেবতা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশ-দেবতা। ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ, অদিতি অনন্ত আকাশ। কিন্তু দ্যৌ বা দ্যু আকাশের কোন্ মূর্ত্তি—এ কথাটা বলা হয় নাই।

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দ্যু বা দ্যৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সূক্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্ত নাম দ্যাবাপৃথিবী।

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহারা দম্পতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী।

কেবল তাই নহে। এই দম্পতি সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বাণত হইয়াছেন। দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা। আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি—বাঙ্গালা সাহিত্যেও "মাতর্ব্বসুমতি!" এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক ঋষিরা যেমন পৃথিবীকে মাতা বলিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। "তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।" (১,৮৩,৪) এই "পিতা দ্যৌঃ" বা "দ্যৌষ্পিতা" অর্থাৎ "দ্যৌষ্পিতৃ" শব্দ গ্রীকদিগের "Zeus Pater" এবং রোমকদিগের "Jupiter" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলে, আকাশ পঞ্চ ভূতের একটি। কিন্তু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। ঋগ্বেদসংহিতায় দর্শনশাস্ত্র নাই—অতএব ঋগ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা "দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী।" বা "দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব্বসবো" ইত্যাদি।

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষক মূর্ত্তি, বরুণ আবরক মূর্ত্তি, অদিতি অনন্তমূর্ত্তি, দ্যু বা দ্যৌ তেমনি জনক মূর্ত্তি। মনুও বলিয়াছেন, "মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তিঃ।"

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথার কোন "প্রমাণ" নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম্মসকল গঠিত হয় নাই। যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না। তবে এই জনকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাশের কি কোন দাবিদাওয়া ছিল না, তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী জুড়িয়া এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল। সকল আদিম ধর্ম্মে আকাশ জনক। অনেক ধর্ম্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম।

বেদে দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। আমরা বলিয়াছি যে, এই "দ্যৌঃ" শব্দই "Zeus," কিন্তু Zeus গ্রীকপুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃতে "গো"। গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি Zeus নহেন, Ouranos পতি। Ouranos দ্যৌঃ নহেন—Ouranos বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রীকপুরাণেও আকাশ পৃথিবীর স্বামী। এবং ইহারাই সেই পুরাণমতে সর্ব্বজীবের জনক-জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না—এবং আমরাও দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।*

উত্তর-আমেরিকার হূরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুজাতি, বন্নিজাতি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পূজিত। উত্তর-আশিয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, কিন্ জাতিদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ।

ঐরূপ আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং চৈনিক জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি।

চৈনিক দার্শনিকেরা ইহার উপর একটু বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা; ইহা হইতে তাঁহারা করিলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শক্তি আছে—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি স্বর্গীয়, একটি পার্থিব। একটির নাম ইন্, আর একটির নাম ইয়ঙ্।

* এই তত্ত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন দ্যৌঃ শব্দ জিয়স্ শব্দে পরিণত হয় নাই। তখন আর্য্যবংশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ দেশে যাত্রা করে নাই। অনেক কালের প্রাচীন কথা।

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুরুষ মনে পড়িবে। ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিকদিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে, তাহা আমরা জানি। বোধ হয়, এই দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্ব, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও মায়াবাদে মিলিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পরিণত হইয়া থাকিবে। সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক উপাসনার উৎপত্তি কি না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে এই দ্যাবাপৃথিবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত নহি।

আমরা এত দিনে যে দুইটি স্থূল কথা বুঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই।

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র—যথা আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ু।

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে আমরা বিচার করিব,

প্রথম। কেন এরূপ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৬৩-৬৭।

## চৈতন্যবাদ

পৃথিবীতে ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টিয়ান বলিবেন, মুসা ও যীশু ধর্ম্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন। বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মের মুসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে

প্রায় মহম্মদ, মুসা, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্ম্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

আর যাঁহারা বলেন যে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে য়িহুদায় য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে ; মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে ধর্ম্ম ছিল, ইস্‌লাম তাহার উপর ও য়িহুদী ধর্ম্মের উপর গঠিত হইয়াছে ; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও এক য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল ; মুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ? তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্ম্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্ম্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম্ম নাই ; সকল ধর্ম্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে—পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল ? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমে পৃথ্বীতলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে ; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি, কি ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেন না, ধর্ম্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি, পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেন না, সভ্য জাতির ধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায় ; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে কিছুই করে না। তাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়—"জীবন" বা "প্রাণ" বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পায় যে, এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছপালারও আছে। গাছপালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত দিন থাকে, তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছপালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছপালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছপালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছপালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয় "চৈতন্য"। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরিলে তাহার শরীর থাকে—অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়া সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক্ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্ন দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক, মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে

অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এবং এইখানেই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে, অসভ্য মানুষ বা আদিম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নির্জ্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, এজন্য নির্জ্জীব চেতন নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড়, পর্ব্বত, জড় পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়াই বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রি দিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত জলসেক করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের কথা বড় আশ্চর্য্য। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিকে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয়। চন্দ্র ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা বা বৃষ্টিরই ইচ্ছা এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড় বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া, উপধর্ম্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম্ম।

মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে, ইহা সম্ভব নহে।

তার পর ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড় পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী বা সুন্দর। সেই আগ্নেয় গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূলপরিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্ কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্ম্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য; ইহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর। ইহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যত ক্ষণ অনুদিত থাকেন, তত ক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ যদি সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী, তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্ব্বদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত হই বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি, তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর, তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ঔষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ভৃত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি। দুগ্ধদায়িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্ম্মিক মনুষ্যকে

ভক্তি করি। এ একজাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।*

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখীটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্যগুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাঁহার মহিষী।

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময়ে ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক, তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্ব্বনের প্রতি অম্লজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল ও বায়ু, এই তিন পদার্থে পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্যসিংহের উক্তিসকল বা কর্ম্মসকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তিবিশিষ্ট, অর্দ্ধেক জগৎ আজিও তাঁহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, উনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে শিব। সুন্দর বা সৌম্যের নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True), শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful), এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা-পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায় অচেতনকে অচেতন বলিয়াই জ্ঞান থাকে। গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর; কেন না, ইহার দ্বারা

* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম্ম! এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেন্ট গবর্ণর হইলেন।

কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলনবিশেষ। এখনকার দেশী পণ্ডিতেরা ( বিশেষ বালকেরা ) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

প্রচারের প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বলিলাম, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক।

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন লোকাতীত চৈতন্য নহেন।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ইহাদিগের দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে।

৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্তি, হিতকারিতা বা সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে।

৪। সেই উপাসনা ইষ্টকারী এবং অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করি।—‘প্রচার,’ ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭৪-৮৩।

## উপাসনা

পূর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনা ; আর এক, যাহাকে ভালবাসি বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমত নহে, সামান্য জড় পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস যে, গোরুকে যত্ন করিলে, আদর করিলে দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য, ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্য্যের মন্ত্রে আছে,

"হে বৎসগণ, তোমরা ক্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে দিগ্দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু-দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক। ৩॥

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা তোমাদিগকে প্রভূততৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪॥

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাপিগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক। ৫॥"*

ঐ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ বলেন।

"হে দুগ্ধ, যজ্ঞীয় সুপবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা তোমাকে পবিত্র করুন।"

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। "হে উখে! তুমি মৃন্ময়, সুতরাং পৃথিবীরূপিণী ত বটই। অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২॥

"হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বলিতে পারি। এতাবতা তুমি ত্রিলোকস্বরূপ। সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে। বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দার্ঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং যজমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হন।" ৩॥

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়াই জানেন। হাঁড়ি কি দুধকে কেহই ইষ্টানিষ্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর মাত্র। গোবৎস সম্বন্ধেও ঐরূপ। অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

চাতুর্ম্মাস্য যাগে দর্ব্বী অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে।

---

* এই প্রবন্ধে যজুর্ম্মন্ত্রের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে।

"হে দর্ব্বি, তুমি অন্নে পরিপূর্ণ হইবায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা করি, পুনরাগমনকালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে।"

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানের মস্তক, কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় কুশাকে বলিতে হয়, "হে কুশাসকল! অতীক্ষ্ণধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কষ্ট হইতে পারে, তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।"

পরে ক্ষৌরকালে ক্ষুরকে বলিতে হয়, "হে ক্ষুর, তুমি যেন ইঁহার রক্তপাত করিও না।"

পরে স্নান করিয়া ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। বস্ত্র পরিধানকালে বস্ত্রকে বলিতে হয়, "হে ক্ষৌম! তুমি কি দীক্ষণীয়, কি উপসদ, উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি।"

তার পর গাত্রে নবনীত মর্দ্দন করিতে হয়। মর্দ্দনকালে নবনীতকে বলিতে হয়। "হে গব্য নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান কর।"

এ সকল স্থানে কি কুশা, কিংবা ক্ষুর বা অস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কেবল যত্নের বস্তুতে যত্নজনক বিধি প্রয়োগ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবের যে স্তুতিসকল ঋগ্বেদে আছে, আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং॥
অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ॥
বৃষায়মানোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং॥
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎ সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুং ন কিলাবিবিৎসে॥
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ॥

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়ৎ ব্যস্তঃ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভূব॥
নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা স্বরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ॥
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র স্বকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্ত সিন্ধূন্॥
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরৎব্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যৎযুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে॥
অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥
ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব॥"

## অনুবাদ

১। "বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি অহি নামে অভিহিত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জলসমূহ ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বত প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদীসকলের কূল ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। ইন্দ্রদেব পর্ব্বতে লুক্কায়িত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টৃদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত গর্জ্জনশীল বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদীসকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গোসকল হম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

৩। বলবান্ ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্য্যুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারক বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য উষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আর কোন শত্রু দেখিতে পান নাই।

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারী বজ্রের সহিত লোকের উপদ্রবকারী বৃত্রাসুরকে লোকে যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদ্রূপ বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাতিত করিয়াছিলেন।

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই, এইরূপ দর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রুনিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্রপ্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদীসকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল।

৭। হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার পাষাণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষবর্জ্জিত ব্যক্তি যদ্রূপ পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।

৮। নদীর জলসকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবনদশায় যে জলসকল বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই জলসকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পতিত রহিল।

৯। বৃত্রাসুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বৃত্রকে ব্যবহিত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে বৃত্রমাতা হত হইয়া গাভী বৎসের সহিত যেমন শয়ন করে, তদ্রূপ মৃত পুত্রের উপর পতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল।

১০। অবিশ্রান্ত প্রবহণশীল নদীসকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জলসমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

১১। দাস এবং অহি নামে প্রসিদ্ধ বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল, যদ্রূপ পণি নামক অসুর গোসকল গুহাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল, তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ

মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদনন্তর আপনি পণি নামক অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ ও নিরুদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। জয় লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহনিরোধ অপনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গর্জ্জন, যে বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ কবিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে অভিভূত করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহণশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বৃত্রাসুর বধের নির্যাতনেচ্ছু কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন?

১৫। বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দ্দান্ত জীবগণের অধীশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নেমি যদ্রূপ চক্রগত অরাখ্য কাষ্ঠসকল বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করেন।"*

এই সূক্তের তাৎপর্য্য বড় স্পষ্ট। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃত্র বৃষ্টিনিরোধকারী নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষণশক্তির দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহিত হইলে বৃত্রবধ হইল। এই সূক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই।

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জড়শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। "জগতের রাজা," এবং "জীবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল উপধর্ম্মে পরিণত হইল।

---

* এই অনুবাদ ৺রমানাথ সরস্বতীকৃত।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কি, তাহা উপরি উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই; এবং ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র বহু দেবতার উপাসনাত্মক উপধর্ম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেকগুলি এমত সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপরি উদ্ধৃত সূক্তের সদৃশ সূক্তগুলি যে আদিম অবস্থায়, আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সূক্তগুলি প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে, সে-ই বুঝিতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সঙ্কলন ব্যতীত চতুর্ব্বেদের বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব আদিম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সূক্ত বলিয়া সূক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা জড়-প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পরিণতি একেশ্বরবাদে। অতএব সূক্তের তাৎপর্য্য বুঝিয়া তাহার সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

এক্ষণে প্রচারের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ;—

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য নহে।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বা আছে।

৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া তাহার শক্তি, হিতকারিতা বা সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে।

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান্, সুন্দর বা উপকারী জড় পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে ইতর দেবোপাসনা এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর এবং উপধর্ম্ম। কিন্তু ইহার মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি। সে সকলের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্দ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে।

বৈদিক ধর্ম্মের এই স্থূল তাৎপর্য্য। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে

রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের একটি স্থূল কথা।

এক্ষণে বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৯৭-৪০৭।

## হিন্দু কি জড়োপাসক ?

যত ক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তত ক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার-সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থসকল সেই দেহের অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে ( Igneous principle ) জড় বলিয়া জানেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া বুঝিতেন। আজকালকার পাশ্চাত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তবে প্রভেদ এই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চেতনাযুক্ত।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্যসম্বন্ধরহিত, ইহা তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাযুক্ত।

ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করিতে চান, অথবা উক্ত শক্তির সাহায্যে যিনি কোন কর্ম্ম করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্ত্রের ঋষি কে—তাহা

জানিতে হইবে। মন্ত্রের ঋষি কে—ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষ্য শক্তি কিরূপ চেতনাযুক্ত, ইহা না জানিয়া যিনি মন্ত্রসাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহাকে পাপভাক্ হইতে হয়, ইহা শ্রুতির কথা।

যোঽহরহরবিদিতঋষিচ্ছন্দো দৈবতবিনিয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্রেণ বা যজতি যাজয়তি বা অধীতে অধ্যাপয়তি বা হোমে কর্ম্মণি অন্তর্জলাদৌ বা স পাপীয়ান্ ভবতি।

এখন দেখ, বেদোক্ত ধর্ম্মাচারী ঋষিগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ক্রমে সঙ্গত হয়? যে পাশ্চাত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্যগণ আজকাল নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা এক বারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তি দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, পাশ্চাত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধানও করেন না। পাশ্চাত্যগণ ঋষি বিনিয়োগাদি না জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রুতিমতে উঁহারা পাপভাগী হইতেছেন।

আমার বোধ হয়, যে দিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে পাশ্চাত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। চেতনাবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত পদার্থ। চেতনাবিহীন পদার্থ আর মৃত শরীর, এই দুইটি কথায় হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু থাকিতে চান না।—'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০।

## হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা

আমরা বেদের দেবতাতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্মকথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া, ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্য-বুদ্ধির কত দূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব।

বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য যে জ্ঞান, তাহাই আদিম মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্কবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং এখনও দেখিতে পাই যে, সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তিসকল অনুশীলিত হয় না, এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জ্জিতবুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, য়িহুদীদিগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুত ঈশ্বরজ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেণ্ট পল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা

* হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাহারা জানেন যে, "বিজ্ঞান" অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। "নীতি" শব্দেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Polities, কিন্তু এখন আমরা "Morals" অর্থে ব্যবহার করি।

করিয়াছি। কেন না, সেইটা গোড়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ব যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্ত্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মাণ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্ব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোলমউনির তাড়নে ঘোল, আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয় ; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডূষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে ; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্ত্তা, শাস্তা, এবং কারণস্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই সেই এক নিয়মে চালিত ; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্ব্বাংশই সেই নিয়মকর্ত্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই এক জনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্ত্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয় ; কেন না, জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে, এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং মনুষ্য ও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও বিশ্বাস থাকে ; কেন না, ইন্দ্রাদিকে লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া

বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও জাতিমধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম—অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম এই যে, একজন ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বকর্ত্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস ঐশিক কার্য্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোককর্ত্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুকর্ত্তা, আলোকদাতা প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে, উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাজেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্ব্বাঙ্গীণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মক্ষমূলের ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া, কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামকরণ করিবেন, তদ্বিষয়িণী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না Theism, না Polytheism, না Atheism—কোন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন —Kakenotheism বা Henotheism. এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মক্ষমূলের বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও

হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে, এই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার—অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিক ধর্ম্মের তিন অবস্থা—

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা, ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কি না, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে 'প্রচারে' যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। "এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব" এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।
—'প্রচার,' ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

## বেদের ঈশ্বরবাদ

প্রবাদ আছে, হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা; কিন্তু বেদে বলে, মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, বেদে বলে—এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত; এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন, শুনা যাউক। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার—আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা হোতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।" ৭।৫।

অর্থাৎ "নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা তাঁহাদিগের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য, যথা—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, এক জনেরই নাম হয়।"

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তেত্রিশের স্থানে মোটে তিন জন দেখিতেছি—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না—জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই—এক দেবতা, তাঁহার কর্ম্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন যে, এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কালসাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতাতেই পাওয়া যায়, "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" (১০।৮৮) "অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তক; প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদয় হন।" পুনশ্চ

"যদেনমদধুর্য্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে "এনং অগ্নিং সূর্য্যং আদিতেয়ং" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ" অর্থাৎ শাকপূণি (পূর্ব্বগামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থানে অগ্নি আছেন।" ভৌম, অন্তরিক্ষ ও দিব্য, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানং।" ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল বা দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, "অগ্নি যম মাতরিশ্বন্।" পুনশ্চ, অথর্ব্ববেদে, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং"—সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

এইরূপে ঋষিরা বুঝিতে লাগিলেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, অন্তরিক্ষের দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদসংহিতা, ৩।৫৫)। এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে, বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দুধর্ম্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান, চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই, উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকে; যাঁহার হাতে চাবি, তিনি কদাচ কখন সিন্ধুক খুলিয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বকশিশ করেন। তাই ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের

পুঁজিপাটা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এত দিন চাবি-তালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্‌ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিন জনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।*

---

* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীণতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থানে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক, অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক। জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সুমীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের ॥৵০ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। প্রচারে কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থসমালোচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ। এজন্য প্রচারে উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে প্রচারে এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন

এইরূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে, এক জনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন—"মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।"

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতাস্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক, ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম **বিশ্বকর্ম্মা।** ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্ত্তার এই নাম—পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১০।৮১।২), বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (ঐ) ৩ ইত্যাদি।

(২) তিনি **হিরণ্যগর্ভ।** এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসেও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে জাত, সর্ব্বভূতের একমাত্র পতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি **প্রজাপতি।** তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা সবিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের একমাত্র চৈতন্যবিশিষ্ট সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া বুঝিলেন, তখন তাঁহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদসংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দও আমি ঋগ্বেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পরভাগ উপনিষদ্, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ-ভাগে ও বাজসনেয়সংহিতায় ও অথর্ববেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী **পুরুষের** বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শতপথব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। অদ্যাপি বিষ্ণুপূজায় পুরুষসূক্তের প্রথম ঋক্ ব্যবহৃত হয়—

---

বিবেচনা করিলাম। বেদে কি আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে—আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি—প্রচারে এত স্থান নাই।

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং ॥

কথিত হইয়াছে যে, এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং"—সমস্ত বিশ্ব ইঁহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহু দেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥ গীতা ৯।২৩

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়* হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝিব—এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম।—'প্রচার,' ২য় বর্ষ, পৃ. ১৪৭-৫২।

## হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। এক জন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বর-জ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

---

* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না, সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্‌সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে, পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষমূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং যিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে, উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে, ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্রস্তোত্র আদিপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের

অধিপতি ; তুমি সহস্রাক্ষ ; তুমি দেব ; তুমি পরমগতি ; তুমি অক্ষয় অমৃত ; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি ; তুমি মুহূর্ত্ত ; তুমি তিথি ; তুমি বল ; তুমি ক্ষণ ; তুমি শুক্লপক্ষ ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র ; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা ; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিলসহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব।" এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদিপর্ব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নিস্তোত্র উদ্ধৃত করি।

"হে হুতাশন ! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায় ; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে ! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন ; তোমা হইতে অস্ত্রসমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে ; হে জাতবেদঃ ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে ; হে দেব ! তুমি দহন ; তুমি ধাতা ; তুমি বৃহস্পতি ; তুমি অশ্বিনীকুমার ; তুমি মিত্র ; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যস্তোত্র এইরূপ—"ওঁ সূর্য্য ; অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, তৃপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়, স্বয়ম্ভু ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হে অশ্বিনীকুমার ! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে ; তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান

হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণুসমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে, কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপ :—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্রসকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোকসকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।"

তার পর আদিপর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড়স্তোত্রে —

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত-বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত, বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।<br>
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে, সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।—'প্রচার,' ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-৭৮।

# অসম্পূর্ণ রচনা

# রাজমোহনের স্ত্রী

[ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে Rajmohan's Wife নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি এই উপন্যাসখানি বাংলায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনুবাদ-কার্য্য ইংরেজী উপন্যাসের মাত্র সাত অধ্যায়ের বেশী অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় ( পৃ. ১-৫০ ) Rajmohan's Wife উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ। ]

মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বসতি-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্ণে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল ; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল ; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগিল।

ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা একটি রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বেশভূষায় ব্যাপৃতা হইলেন। স্ত্রীজাতির এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদনে রমণীর কালবিলম্ব হইল না ; একটু জল, একখানি টিনে-মোড়া চারি আঙ্গুল বিস্তার দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখানি চিরুণির দ্বারা এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। এতদ্ব্যতিরেকে কিছু সিন্দূরের গুঁড়ায় ললাট বিশোভিত হইল। পরিশেষে একটি তাম্বূলের রাগে অধর রঞ্জিত হইল। এইরূপে জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির একজন মহারথী সশস্ত্র হইয়া কলসীকক্ষে যাত্রা করিলেন, এবং কোনও প্রতিবাসীর বংশ-রচিত দ্বার সবলে উদ্ঘাটিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

যে গৃহমধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে চারিখানি চালা ঘর—মাটির পোতা —ঝাঁপের বেড়া। কুটীরমধ্যে কোথাও দারিদ্র্যলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল না—সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চতুষ্কোণ উঠানের চারি দিকে চারিখানি ঘর। তিনখানির দ্বার উঠানের দিকে—একখানির দ্বার বাহিরের দিকে। এই ঘরখানি বৈঠকখানা—অপর তিনখানি চতুষ্পার্শ্বে আবরণবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপসম্মুখে সুকর্ষিত ভূমিখণ্ডে কিছু বার্ত্তাকু শাকাদি জন্মিয়াছিল। চারি পার্শ্বে নলের বেড়া ; দ্বারে ঝাঁপের আগড় ; সুতরাং অবলা অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য যে, লব্ধপ্রবেশা প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসী বা পুরবাসিনীবর্গ মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে স্ব স্ব কার্য্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা

বলিতে পারি না। কেবলমাত্র তথায় দুই ব্যক্তি ছিল; একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী বস্ত্রোপরে কারুকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, আর একটি চারি বৎসরের শিশু খেলায় মগ্নচিত্ত ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালায় যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্যাধার ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশু সেই মসীপাত্র দেখিতে পাইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কালি মুখে মাখিতেছিল; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাড়িয়া লয়, বাছা যেন এই ভয়ে সকল কালিটুকু একেবারে মাখিয়া ফেলিতেছিল। অভ্যাগতা, কারুকার্য্যকারিণীর নিকট ধরাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছিস্ লো?"

সম্বোধিতা রমণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ; না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।"

অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, "আর কার মুখ দেখে উঠ্‌বে? রোজ যার মুখ দেখে উঠ, আজও তার মুখ দেখে উঠেছ।"

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল; অপরা নারীর অধরমূলে হাস্য অর্দ্ধপ্রকটিত রহিল। এই স্থলে উভয়ের বর্ণনা করি।

অভ্যাগতা যে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা—কাল নয়—কিন্তু তত শ্যামও নয়। মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয়; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের 'হাসি হাসি'-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটি মুটের বোঝা বটে। যে শঙ্খবণিক্ সেই বিশাল শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকর্ম্মার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র সন্দেহ নাই। আভরণময়ীর স্থূলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল; শাটীখানি বুঝি রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গতিবিধি করে নাই।

অষ্টাদশবর্ষীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূর্ব্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানীসন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণচ্ছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্নরবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধপ্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল। অতিবর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তলসকল বন্ধনদশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়ন-

পল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখা যাইত ; কিন্তু যখন সে পল্লব উর্দ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষ স্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন, নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকটিত হইল। কিন্তু সে যৌবনমদমত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপে চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত ; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত সুখ দুঃখ বিরাজ করিতেছে। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল ; তথাচ পরিধেয় পরিষ্কার শাটীখণ্ডমধ্যে যাহা অর্দ্ধদৃষ্ট হইতেছিল, তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র প্রকোষ্ঠে 'চুড়ি' ও বাহুতে 'মুড়কিমাছুলি' ; ইহাও বড় সুগঠন।

তরুণী হস্তস্থিত সূচ্যাদি এক পার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহযন্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সদ্বক্তৃত্ব প্রকাশ করিলেন ; দোষের মধ্যে এই, যে যন্ত্রণাগুলিন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাল্পনিক। বক্ত্রী নিজ কর্দ্দমময় বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগিলেন ; বিধাতা তাঁহাকে যে চক্ষুযুগল দিয়াছিলেন, সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয় ; কিন্তু কি হবে ?—অবস্থাবিশেষে শালগ্রামেরও মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যত বার কাপড়খানা এসে ঠেকে, তত বার চক্ষু দুইটি কামধেনুর মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। বক্ত্রী-চূড়ামণি অনেক বার অশ্রুবৃষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া কাঁদিবার উদ্যোগে ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কথিত চক্ষু দুইটি সেই সময় সেই শিশুটির কালিময় মুখের উপর পড়িল ; শিশুটি মসীপাত্র শূন্য করিয়া অন্ধকারময় মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দেখিয়া গৃহযন্ত্রণাবাদিনী কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ; রসের সাগর উথলিয়া যন্ত্রণাদি ভাসাইয়া দিল।

রোদনাদির ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্য্যদেবকে সত্য সত্যই অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগী দেখিয়া বক্ত্রী তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। বস্তুতঃ এই আমন্ত্রণের জন্যই এত দূর আসা। নবীনা বারি-বাহনার্থ যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। নবীনা কহিলেন, "মধুমতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমীরে খাবে।"

ইহা শুনিয়া সঙ্গিনী যে ঘোর হাস্য করিল, নবীনা তাহাতেই বুঝিলেন,—তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "যাবি কখন লা কনক, আর কি বেলা আছে ?" "এখনও দুপুর বেলা" বলিয়া কনক অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইলেন যে, এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকর বৃক্ষোপরে দীপ্তিমান্ রহিয়াছে।

নবীনা তখন কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, “তুই জানিস্ ত কনক দিদি, আমি কখন জল আনিতে যাই না।”

কনক কহিল, “সেই জন্যই ত যাইতে কহি, তুই কেন সারাদিন পিঁজরেতে কয়েদ থাক্‌বি? আর বাড়ীর বউমানুষে জল আনে না?”

নবীনা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, “জল আনা দাসীর কর্ম্ম।”

“কেন, কে জল এনে দেয় লো? দাসী চাকর কোথা?”

“ঠাকুরঝি জল আনে।”

“ঠাকুরঝি যদি দাসীর কর্ম্ম করিতে পারে, তবে বৌ পারে না?”

তখন তরুণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে কহিল, “কথায় কাজ নাই কনক! তুমি জান, আমার স্বামী আমাকে জল আনিতে বারণ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে চেন ত?”

কনকময়ী কোনও উত্তর না করিয়া সচকিত কটাক্ষে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, যেন কেহ আসিতেছে কি না দেখিলেন। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া সমভিব্যাহারিণীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিতে বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশঙ্কাপ্রযুক্ত কথনেচ্ছা দমন করিয়া অধোদৃষ্টি করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস্?”

কনক কহিল, “যদি—যদি তোর চোখ্ থাক্‌ত—”

নবীনা আর না শুনিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নিষেধ করিয়া কহিল, “চুপ্ কর্, চুপ্ কর্—বুঝিয়াছি।”

কনক বলিল, “বুঝিয়া থাক ত কি করিবে এখন?”

তরুণী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ঈষৎ অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রক্তিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, যুবতীর মনোমধ্যে কোন্ চিন্তা প্রবল। তাদৃশ ঈষৎ দেহকম্পনে আরও দেখা গেল যে, সে চিন্তায় হৃদয় অতি চঞ্চল হইতেছে। ক্ষণেক পরে কহিলেন, “চল যাই, কিন্তু ইহাতে কি পাপ আছে?”

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “পাপ আছে! আমি ভুঁড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাস্ত্রের খবরও রাখি না; কিন্তু আমার আড়াই কুড়ি মিন্‌সে থাকিলেও যাইতাম।”

“বড় বুকের পাটা” বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল; “পঞ্চাশটা! হাঁ লো, এতগুলো কি তোর সাধ?”

কনক দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল, “মুখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়াছেন, পঞ্চাশটাও যদি তেমনি হয়, তবে কোটীখানেকেই বা কি ক্ষতি? কাহারও সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইল, তবে আমি কোটী পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতী সাধ্বী পতিব্রতা।”

"কুলীনে কপাল" বলিয়া তরুণী চঞ্চল পদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন করিলেন। যেমন বারিবাহিনী, তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহিণী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, "এখন এস দেখি মোর গৌরবিণী, হাঁ-করাগুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।"

"মর্ পোড়ার বাঁদর" বলিয়া কনকের সমভিব্যাহারিণী অবগুণ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপনীত সূর্য্যকর নারিকেলাদি বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নিশা ধরাবাসিনী হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সমভিব্যাহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ব্ববঙ্গ-মধ্যে তদ্রূপ উদ্যান বড় বিরল। সুশোভন লৌহ রেইলের পরিধিমধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মল্লিকার কলি পথিকার নেত্রমোদন করিতেছিল। পূর্ব্বতন পদ্ধতিমত চতুষ্কোণ ও অণ্ডাকার বহুতর চান্‌কার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সুরচিত ছিল। উদ্যানমধ্যে একটি পুষ্করিণী। তাহার তীর কোমল তৃণাবলিতে সুসজ্জিত; এক দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল।

বয়োধিক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে; দীর্ঘ শরীর, স্থূলাকার পুরুষ। অতি স্থূলকায় বলিয়াই সুগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম; কান্তি কোনও অংশে এমত নহে যে, সে ব্যক্তিকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে; বরং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; কিন্তু তাহার বিশেষত্ব কি যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয় করা দুর্ঘট। কটিদেশে ঢাকাই ধুতি, লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই চাদরে মাথায় পাগড়ি বাঁধা। পাগড়িটির দৌরাত্ম্যে যে দুই একগাছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গাত্রে;—সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখানিও উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার মন্দর পর্ব্বতে বাসুকির ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, সে একেবারে পিরহাণের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিরহাণে সোনার বোতাম, তাহাতে চেন্ লাগান; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয়; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য দুইখানি পায়ে ইংরাজী জুতা।

ইহার সমভিব্যাহারী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাঁহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের অসদ্ভাবেই হউক বা ঐহিক সুখ সম্ভোগেই হউক, ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ অনতিমূল্যবান্,—একখানি ধুতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি কেম্ব্রিকের পিরাণ; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একটি আংটি; কবচ নাই, হারও নাই।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল, "তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়াছ! আবার এ রোগ কেন?"

মাধব উত্তর করিলেন, "রোগ কিসে? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ।"

মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে?"

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আমবাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাস; আমি কলিকাতার দুর্গন্ধে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাসি।

মথুর। শুধু দুর্গন্ধ! ডেরেনের শুকো দই; তাতে দুটা একটা পচা ইঁদুর, পচা বেরাল উপকরণ—দেবদুর্ল্লভ।

মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া, নূতন গাড়ী—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল্। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কনকিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আস্মান থেকে পড়েছে?—তাই ত বটে! ওর সঙ্গে ওটি কে?

মাধব কিঞ্চিৎ রক্তিমকান্তি হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হেসে হেসে মরে।"

মথুর। তা হউক—সঙ্গে কে?

মাধব। তা আমি কেমন করিয়া বলিব, আমার কি কাপড় ফুঁড়ে চোখ চলে? ঘোমটা দেখিতেছ না?

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসীকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কনককে সকলেই চিনিত; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতি পদসঞ্চারে যে অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য

বিকাশ হইতেছিল, তাঁহার বস্ত্র ভেদ করিয়া যে অপূর্ব্ব অঙ্গসৌষ্ঠব দেদীপ্যমান হইতেছিল, তাহাতে প্রথমে মাধবের, পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ হইল; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বনিদত্তচিত্ত কুরঙ্গের ন্যায় অবহিত মনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শেষ লিখিত কয়েকটি কথা যে সময়ে মাধবের মুখ হইতে নির্গত হইল, সেই সময় একবার মন্দ সমীরণ-হিল্লোল রমণীদিগের শিরোপরে বাহিত হইল; এই সময় তরুণী স্বীয় কক্ষস্থিত কলসী অনভ্যস্ত কক্ষে উত্তমরূপে বসাইবার জন্য অবগুণ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময়, দুষ্ট সমীরণ অবগুণ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল। মুখ দেখিয়া মাধব বিস্মিতের ন্যায় ললাট আকুঞ্চিত করিলেন। মথুর কহিল, "ওই দেখ—তুমি ওকে চেন?"

"চিনি।"

"চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এইখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয় দিন! চেন যদি, তবে কে এটি?"

"আমার শ্যালী।"

"তোমার শ্যালী? রাজমোহনের স্ত্রী?"

"হাঁ।"

"রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখন দেখি নাই?"

"দেখিবে কিরূপে? উনি কখন বাটীর বাহির হয়েন না।"

মথুর কহিল, "হয়েন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন?"

মাধব। কি জানি।

মথুর। মানুষ কেমন?

মাধব। দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর।

মথুর। ভবিষ্যদ্বক্তা গণকঠাকুর এলেন আর কি! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল?

মাধব। ভাল মানুষ কাহাকে বল?

মথুর। আঃ, কালেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা চলা ভার। বলি ওর কি—?

মাধবের বিকট ভ্রূভঙ্গ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মাধব গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যক কি?"

মথুর কহিল, "বলিয়াছি ত, দু' পাত ইংরাজি উল্‌টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না ত কাহার কথা কব? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব? যাক্‌ চুলায় যাক্‌; মুখখানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহুনে গোবর্দ্ধন এমন পদ্মের মধু খায়?"

মাধব কহিল, "বিবাহকে বলিয়া থাকে সুরতি খেলা।"

এইরূপ আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কনকময়ী এবং তৎসঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোকের সম্মুখে কথা কহিতে কনকের সহচরী অতি লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নীরব। কিন্তু এমন লোকালয়মধ্যে রসনারূপিণী প্রচণ্ডা অশ্বিনী যে নিজ প্রাখর্য্যাদি গুণ দেদীপ্যমান করিতে পারিল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদুঃখ রহিল। তাঁহারা আপনাপন গৃহ-সান্নিধ্যে আসিলেন; তথায় লোকের গতিবিধি অধিক না থাকায় কনীয়সী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, "কি পোড়া কপালে বাতাস দিদি, আমাকে কি নাস্তানাবুদই করিল।"

কনক হাসিয়া কহিল, "কেন, তোমার ভগ্নীপতি কি কখন তোমার মুখ দেখে নাই?"

কনীয়সী। আমি ত তাহার জন্য বলিতেছি না—অন্য একজন যে কে ছিল।

কনক। কেন, সে যে মথুরবাবু; তাহাকে কি কখন দেখ নাই?

কনীয়সী। কবে দেখিলাম?—আমার ভগ্নীপতির জ্যেঠাত ভাই মথুরবাবু?

কনক। সে না ত কে?

কনীয়সী। কি লজ্জা বোন্‌, কাহারও সাক্ষাতে বলিস্‌ না।

কনক। মরণ আর কি! আমি লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছিলে।

এই বলিয়া কনক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তরুণী সরোষে কহিল, "তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন? কথার রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসিতাম?"

কনক পুনরায় হাস্য করিতে লাগিল; যুবতী কহিলেন, "তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না—সর্ব্বনাশ! দুর্গা যা করেন।"

এই বলিয়া নবীনা গৃহাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরা হইল। কনকময়ীও সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই আকস্মিক ভীতির হেতু অনুভূত করিলেন। তাঁহারা প্রায়

গৃহ-সান্নিধ্যে উপনীতা হইয়াছিলেন। কনক দেখিতে পাইল যে, দ্বারে অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নে কালমূর্ত্তির ন্যায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সঙ্গিনীর কর্ণে কর্ণে সে কহিল,— "আজ দেখিতেছি মহাপ্রলয়; আমি তোর সঙ্গে যাই, যদি অকূলে কাণ্ডারী হইতে পারি।"

রাজমোহনের স্ত্রী তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "না, না, আমারও সহ্য আছে—তুমি থাকিলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও।"

ইহা শুনিয়া কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচরী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় রাখিলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসীটি রাখিলে রাজমোহন কহিল, "একটু দাঁড়াও।" এই বলিয়া জলের কলসী লইয়া আঁস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া ফেলিলেন। রাজমোহনের একটি প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রতি; তিনি এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া রাজমোহনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "আবার জলটা অপচয় করিতেছিস্ কেন রে? তোর ক'গণ্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে?"

"চুপ কর্ মাগী হারামজাদী" বলিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জ্বালাকর স্বরে কহিল, "তবে রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

রমণী অতি মৃদুস্বরে দার্ঢ্য সহকারে কহিল, "জল আনিতে গিয়াছিলাম।"

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, তিনি তথায় চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অস্পন্দিতকায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "জল আনিতে গিয়াছিলে! কারে ব'লে গিছ্‌লে ঠাকুরাণি?"

"কাহারেও বলে যাই নাই।"

রাজমোহন আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ করিতে পারিল না, চীৎকার স্বরে কহিল, "কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?"

অবলা পূর্ব্ববৎ মৃদুভাবে কহিল, "করেছ।"

"তবে গেলি কেন হারামজাদি?"

রমণী অতি গর্ব্বিত বচনে কহিল, "আমি তোমার স্ত্রী।" তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

"গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।"

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন ; বজ্রনাদবৎ চীৎকারে কহিলেন, "আমি তোকে হাজার বার বারণ করেছি কি না ?" এবং ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া চিত্রপুত্তলিসম স্থিররূপিণী সাধ্বীর কোমল কর বজ্রমুষ্টে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

অবলা বালা কিছু বুঝিলেন না ; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রী-ঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত বজ্রনিনাদে কহিল, "তোরে লাথিয়ে খুন করব।"

তথাপি তিরস্কৃতা কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল। ঈদৃশী মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে দেখিয়া নিষ্ঠুর কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইল। সহধর্ম্মিণীর অচলা সহিষ্ণুতা দৃষ্টে প্রহারোদ্যমে বিতথপ্রযত্ন হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে অবাধে বজ্রতাড়ন হইতে লাগিল। সে মধুমাখা শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণ পীড়ন করা অবিধেয়। ধীরা সকলই নীরবে সহ্য করিল। ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খর্ব্ব হইয়া আসিল ; তখন প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল। তিনি ধীরে ধীরে ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর কর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন ; এবং যাইতে যাইতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাও সাবধানে, সাবধানে—সাবধানের মার নাই। যখন দেখিলেন যে, রাজমোহনের ক্রোধ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বর্ষীয়সী একেবারে স্বীয় কণ্ঠকূপ হইতে প্রচণ্ড তিরস্কার-প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলিন কুকথা মুখনির্গত করিয়াছিল, প্রায় সকলগুলিরই উপযুক্ত মূল্যে প্রতিশোধ দিলেন। রাজমোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া ব্যস্ত, পিসীর মুখ-নিঃসৃত ভাষালালিত্যের বড় রসাস্বাদন করিতে পারিলেন না ; আর পূর্ব্বে সে রস অনেক আস্বাদন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ করিলেন না। দুই জনে দুই দিকে গেলেন ; পিসী বধূকে সান্ত্বনা কারতে লাগিলেন। রাজমোহন কাহার মাথা ভাঙ্গিবেন, ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় হইল, তাঁহাদিগের পূর্ব্ববিবরণ কথনে প্রবৃত্ত হই।

পূর্ব্বাঞ্চলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলয়ে বংশীবদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল। এই ভূস্বামীর বংশ ও নাম এক্ষণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি

ছিল। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? দ্বিতীয় পত্নীও সন্তানরত্ন-প্রসবিনী হইলেন না। না হউন, বার্দ্ধক্যে তরুণী স্ত্রী একাই এক সহস্র। সত্য বটে, মধ্যে মধ্যে দুই সপত্নীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত করিতেন; কখন কখন কর্ত্তার নিকট আসিয়া উভয়ে চীৎকারের মহলা দিতেন; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতেন; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেন। এমনও কখন হইয়াছে যে, ছেঁড়া-ছিঁড়ি নাক কাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেই প্রায় উলু খাক্ড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে,—বৃদ্ধ, সহধর্ম্মিণীদিগের সমর সময়ে নিকটে থাকিলেই লাথিটা গুঁতাটায় বঞ্চিত হইতেন না; কনিষ্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে করিতেন,—এইবার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে উঠিলেন; এমনই লাথির জোর। জ্যেষ্ঠা সর্ব্বদা বলিতেন, "বড়র বড়, ছোটর ছোট।" শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া "বড়র বড়, ছোটর ছোট" বলিয়া বড়কে আগে অন্তর্হিত করিল।

বয়োধিকা পত্নীর মৃত্যু দেখিয়া প্রাচীন মনে করিলেন, "ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে"; আমাকেও কোন্ দিন ডাক পড়ে এই। মরি তাতে ক্ষতি নাই, বার ভূতে বিষয়টা খাবে।

প্রেয়সী যুবতীর সাক্ষাতে মনের কথা বলিলে প্রেয়সী বলিলেন, "কেন, আমি আছি, আমি কি তোমার বার ভূত?" বৃদ্ধ কর্ত্তা কহিলেন, "তুমি যেখানে এক বিঘা জমি স্বহস্তে দান বিক্রয় করিতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করিলে কি?" চতুরা কহিল, "তুমি মনে করিলে সব পার; বিষয় বিক্রয় করিয়া আমায় নগদ টাকাটা দাও না।" তথাস্তু বলিয়া ভূস্বামী ভূমি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মন দিলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই বলবতী যে, যখন বৃদ্ধ লোকান্তরে গমন করিল, তখন তাহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্বর্ণরৌপ্য-রাশিতেই ছিল—ভূমি অতি অল্প ভাগ। করুণাময়ী বড় বুদ্ধিমতী; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এখন ত সকলই আমার; ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে। ধন জন যৌবন সকলই বৃথা; যত দিন থাকে, তত দিন ভোগ করিতে হয়।"

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যখন জানকীবিচ্ছেদে কাতর হন, তখন কি করেন, সীতার একটি সুবর্ণপ্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ স্বামীর কোনও প্রতিমূর্ত্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুঃসহ বিরহযন্ত্রণা নিবারণ না করেন কেন? আরও ভাবিলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেন; নির্জ্জীব ধাতুতে যদি মনোদুঃখ নিবারণ হয়, তবে যদি একটা সজীব পতিপ্রতিনিধি করি, তা হ'লে আরও সুখদ হইবে সন্দেহ কি? কেন না, সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্তি হইবে এমত নহে, সময়ে সময়ে কার্য্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী

স্থির করা আবশ্যক। পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপতি রাখাও ভাল; বিশেষ শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি আর কিন্তু আছে?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া করুণাময়ী স্বামীর সজীব প্রতিমূর্ত্তিত্বে কাহাকে বরণ করিবে, ভাবিতে ভাবিতে বংশীবদন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল; বংশীবদনকে আর কে পায়? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম আদৌ, কাম মোক্ষ—পশ্চাৎ। এই তিনকে যদি করুণাময়ী ভৃত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিল, রহিল অর্থ। অর্থ আর কয় দিন বাকি থাকে? খানসামা বাবু অতি শীঘ্র সদর নায়েব হইয়া বসিলেন। কালে সকলের লয়,—কালে প্রণয়ের লয়—কালে প্রণয়ীর লয়,—প্রণয়ময়ী অতি শীঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদ মৃত স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

প্রথমে করুণাময়ীর অতি সামান্য জ্বর হয়; জ্বরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। লোকে বংশীবদনের নানামত নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ কেহ এমনও কহিল যে, সে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করণাশায় করুণাময়ীকে বিষ পান করাইয়াছিল। যাহাই হউক, করুণাময়ী প্রাণত্যাগ করিলেন।

বংশীবদন প্রণয়িনী বিয়োগের মনোদুঃখেই হউক, অথবা "যঃ পলায়তি স জীবতি" বলিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ চাকরিস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিলেন।

করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য। অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও বংশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয় ভূষণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রেরা তাদৃশ সাবধানতা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন, অট্টালিকা ও ক্রীড়া-হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ রামকান্ত অতি বিষয়কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার দক্ষতার ফলে তাঁহার অংশ দ্বিগুণাধিক সম্বর্দ্ধিত হইল।—রামকান্ত এই সম্বর্দ্ধিত সম্পত্তি নিজ দক্ষতর পুত্র মথুরমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রামকান্তের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাদি যে সকল স্থান বিদ্যাভ্যাস জন্য অধুনা সংস্থাপন হইতেছিল, তৎসমুদায়ই কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র;—সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরাজি বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই। বাল্যাবধি বিষয়কার্য্য সম্পাদনে পিতৃসহযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল; প্রজাপীড়ন, তঞ্চকতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিদ্যাতে বিশেষ নিপুণতা অর্জ্জিত হইয়াছিল।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যপথাবলম্বী হইল। তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন; এজন্য অল্পকালেই অতুল ঐশ্বর্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন বাটী, মধ্যম বাবুর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবুরই নয়। কিন্তু মধ্যম বাবুর জমিদারীও সর্ব্বাপেক্ষা লাভশূন্য; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রূপ অপদার্থ। শেষে কতিপয় শঠ চাটুকার তাঁহাকে কোন বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সংলিপ্ত করিল। কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় ঈদৃশ অপরিসীম অর্থলাভের সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, সরলচিত্ত ভূস্বামি-পুত্র দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় গেলেন; এবং বাণিজ্যোপলক্ষে ধূর্ত্ত চাটুকারদিগের করে পতিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। পরিশেষে ঋণ পরিশোধার্থ তাবৎ ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল।

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াছিল,—রাজধানীবাসীদিগের পদ্ধতি অনুসারে নিজ পুত্র মাধবকে দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। আরও মনুষ্যজন্মের সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সহিত মাধবের পরিণয় ঘটাইয়াছিলেন।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিত। জগদীশ্বর যেমন কাহাকে সর্ব্বাংশে সুখী করেন না, তেমনই কাহাকেও সর্ব্বাংশে দুঃখী করেন না। কায়স্থের দুস্তর দুঃখসাগরতলে অমূল্য দুই রত্ন জন্মিয়াছিল,—তাঁহার দুই কন্যাতুল্যা অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অথবা অকলুষিতচরিত্রা আর কোন কামিনী তৎপ্রদেশে ছিল না। কিন্তু রূপেই বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে,—ললাটলিপিদোষে হউক বা যে কারণেই হউক, সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গদেশসম্ভূত কত রমণীরত্ন শূকরদন্তে দলিত হয়,—কায়স্থের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টেও তদ্রূপ হইল—নীচস্বভাব রাজমোহন তাঁহার স্বামী হইল।

রাজমোহন কর্ম্মঠ, কোনও উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে; তাহার বাটীও নিকটে। এজন্য কন্যাকর্ত্তার ও কন্যাকর্ত্রীর পাত্র বড় মনোনীত হইল,—রাজসিংহাসনের যোগ্যা কন্যা মাতঙ্গিনী দুষ্টের দাসী হইলেন। কনিষ্ঠা হেমাঙ্গিনীর প্রতি বিধাতা প্রসন্ন,—মাধবের সহিত তাঁহার পরিণয় হইল।

মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে রামকানাই লোকান্তরে গমন করিলেন। মাধব পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন। বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও দ্বিতীয়ের ন্যায় হতভাগ্য ছিলেন না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি এই মর্ম্মে উইল করিলেন যে, মাধব

তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেক, বিধবা স্ত্রী যত দিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন তত দিন তাঁহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্র।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগের পরেও মাধব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য্যকারকেরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোদ্যত হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন।

মাতঙ্গিনী তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজমোহন সময়ের সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "পূর্ব্বে কোনরূপে দিন যাপন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কাজকর্ম্ম প্রায় রহিত হইয়াছে; আমাদিগের সহায় মুরুব্বি মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, অনুগ্রহ করিলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।"

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন অতি দুর্নীতস্বভাব, কিন্তু সরলা মাতঙ্গিনী তাহার গৃহিণী হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ পাইতেছিলেন, ইহাতে মাধবের অন্তঃকরণে রাজমোহনের উপর মমতা জন্মাইল। তিনি বলিলেন, "আমার পূর্ব্বাবধি মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তির হস্তে বিষয়কর্ম্মের কিয়দংশ ভার ন্যস্ত করিয়া আপনি কতকটা ঝঞ্চাট এড়াই; তা মহাশয় যদি এ ভার গ্রহণ করেন, তবে ত উত্তমই হয়।"

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মাধব যে প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহাতে রাজমোহনের আশার অতিরিক্ত ফল হইতেছে; কেন না, সে যদি মাধবের জমিদারীর একজন প্রধান কর্ম্মকারক হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপার্জ্জনের সীমা থাকিবে না। কিন্তু এক দোষ যে, দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। রাজমোহন উত্তর করিল, "আমার প্রতি মহাশয়ের দয়া যথেষ্ট; কিন্তু যদি মহাশয়ের সহিত যাইতে হয়, তা'হলে পরিবার কাহার কাছে রাখিয়া যাই?"

মাধব বলিলেন, "সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? একই সংসারে দুই ভগিনী একত্র থাকিবেন, মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা, তেমনই ভাবে থাকিবেন।"

এই শুনিয়া রাজমোহন ভ্রূভঙ্গ করিয়া মাধবের প্রতি চাহিয়া সক্রোধে বলিল,—"না মহাশয়, প্রাণ থাকিতে এমন কখনও পারিব না।"

এই বলিয়া রাজমোহন তদ্দণ্ডেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যাগমন করিল, এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, "মহাশয়, সপরিবারে দূরদেশে যাওয়া আমি পারৎপক্ষে স্বীকার নহি, কিন্তু কি করি, আমার নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক্ ঘর দ্বারের বন্দোবস্ত না হইলে যাওয়া হয় না।"

যাচকের যাচ্ঞার ভঙ্গী পৃথক্, নিয়মকর্ত্তার ভঙ্গী পৃথক্। মাধব দেখিলেন, রাজমোহন যাচক হইয়া নিয়মকর্ত্তার ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "তাহার আশ্চর্য্য কি? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন।"

রাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল।

রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ এমত অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষণে বাটী থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল; অনিচ্ছার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ নাই।

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্য্যের নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন; গৃহ নির্ম্মাণ করিতে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নির্ম্মাণ-প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন।

রাজমোহন বিনা নিজ ব্যয়ে নিজোপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নির্ম্মাণ করিলেন। সেই গৃহের মধ্যেই এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত।

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতন-ভোগী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন না।—প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মাত্র। রাজমোহনের কালক্ষেপণের উপায়াভাব প্রযুক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান করিলেন; রাজমোহন প্রায় এই কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন।

এইরূপে মাধবের নিকট শোধনাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। রাধাগঞ্জে আসা অবধি রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রীতিসূচক এবং অপ্রীতিজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন; উভয়ে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি অতি কদাচিৎ সংঘটন হইত। এইরূপ আচরণে মাধব কখন দৃক্‌পাত করিতেন না—দৃক্‌পাত করিলেও তদ্ধেতু বিরক্তি বা বদান্যতার লাঘব জন্মাইত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী পরস্পর প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন, তথাপি তাঁহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। হেমাঙ্গিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজাসন্নিধানে শিবিকা প্রেরণ করিতেন; কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভগিনীগৃহে গমন করিতে দিতেন না। হেমাঙ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন?

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে আখ্যায়িকার সূত্র পুনঃ গ্রহণ করা যাইতেছে। পুষ্পোদ্যান হইতে মাধব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে একজন পত্র-বাহক তাঁহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপির শিরোনামার স্থলে "জরুরি" এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। সদর মোকামে যে ব্যক্তি তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তি এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"মহিমার্ণবেষু—

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকর্দ্দমা জাতের তদ্বিরে নিযুক্ত আছে, এবং তাহাতে যেমত যেমত আবশ্যক, তাহা সাধ্যমত আমলে আনিতেছে। ভরসা করি, সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটনা হইবেক। সম্প্রতি অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হুজুরের গোচরে নিবেদন করিতে অধীনের সাহসাভাব। হুজুরের শ্রীমতী খুড়ী ঠাকুরাণীর উকিল হুজুরের নামে অদ্য এ মোকামের প্রধান সদর আপিল আদালতে এই দাবিতে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তঞ্চক,—হুজুর কর্ত্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিষয়াদি হইতে তেঁহ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবি ইত্যাদি।"

পত্রী মাধবের হস্তস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল। মনে যে তাঁহার কিরূপ ক্রোধাবির্ভাব হইল, তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। বহু ক্ষণ চিন্তার পর পত্রী মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ললাটের স্বেদস্ফুতি করদ্বারা বিলুপ্ত করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—

"ইহার ছলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই ; কিন্তু অধীন অনেক অনুসন্ধান করিতেছে ও করিবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্ত্রীলোক এরূপ নালিশ উত্থাপন করিবেন। অধীন অদ্য পরম্পরায় শ্রুত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।"

মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে ? মাধব অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন একজন প্রতিযোগী প্রতিবাসীর প্রতি সন্দেহ, কখনও বা অপরের প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বলিয়া বোধ হইল না।

পত্রপাঠে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন ঃ—

"অধীনের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না, 'যতো ধর্ম্মঃ ততো জয়'। কিন্তু যেরূপ বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে সতর্কতার আবশ্যক।—বাবুদিগের এক্ষণে ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক—পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কৌন্সিলী আনান কর্ত্তব্য হইবেক। তৎপক্ষে হুজুরের যেমন মর্জি। আজ্ঞাধীন প্রাণপণে হুজুরের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল—সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেক না। ইতি তারিখ—

আজ্ঞানুবর্ত্তী শ্রীহরিদাস রায়।"

"পুনশ্চ নিং—

আপাততঃ মোকর্দ্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যেরূপ হুজুর বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন।"

পত্রপাঠ সমাপন মাত্র মাধব, খুল্লতাত-পত্নী অনুসন্ধানে পুরমধ্যে চলিলেন। ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতেছিল, অতি তরল পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্নী কোন্ মুখে জাল সাজ বলিয়া বিচারাগারে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন স্থির করিলেন।

পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সন্ধ্যাকাল পাইয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা যে হট্টগোল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কর্ণপাত করাই কষ্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক। কোথাও কোন রূপসী—একে স্থূলাকার, তাহাতে মেঘের বর্ণ—নানামত চীৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা চাহিতেছে, এবং নানামত মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী করিতেছে,—যেন একটা ক্ষুদ্র হস্তিনী কেলি করিতেছে। কোথাও একটি পরিচারিকা তদ্রূপ বিশাল দেহ-পর্ব্বত লইয়া ব্যস্ত—প্রায় বিবসনা—গৃহ মার্জ্জন করিতেছে; এবং যেমন ত্রিশূলহস্তে অসুরবিজয়িনী প্রমথেশ্বরী প্রতি বার শূলাঘাতে অসুরদল দলিত করিয়াছিলেন, পরিচারিকাও করাল সম্মার্জ্জনী হস্তে রাশি রাশি জঞ্জাল, ওজলা, তরকারির খোসা প্রভৃতি দলিত করিতেছিল, এবং যে আঁটকুড়ীরা এত জঞ্জাল করিয়াছিল, তাহাদিগের পতিপুত্রের মাথা মহাসুখে খাইতেছিল। কোথাও অপরা কিঙ্করী আঁস্তাকুড়ে বসিয়া ঘোর রবে বাসন মাজিতেছিল,—পাচিকার অপরাধ, সে কেন কড়া বগুনায় পাক করিয়াছিল?—তাই কিঙ্করীর এ গুরুতর কর্ম্মভোগ; যেমন মার্জ্জন-কার্য্যে তাহার বিপুল করযুগল ঘর্ ঘর্ শব্দে চলিতেছিল, রসনাখানিও তদ্রূপ দ্রুতবেগে পাচিকার চতুর্দ্দশ পুরুষকে বিষ্ঠাদি ভোজন করাইতেছিল। পাচিকা স্বয়ং তখন স্থানান্তরে, গৃহিণীর সহিত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছিলেন, আঁস্তাকুড়ে যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের আহারাদির পক্ষে এমন অন্যায় ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা কিছুমাত্র জানিলেন না—ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্তা। গৃহিণী পাকার্থ যতটুকু ঘৃত প্রয়োজন, ততটুকু দিয়াছেন, কিন্তু পাচিকা তাহাতে সন্তুষ্টা নহেন। তিনি মনে মনে

স্থির করিয়াছিলেন যে, যতটুকু পাকার্থ আবশ্যক, তাহার দ্বিগুণ ঘৃত কোন সুযোগে লওয়াই যুক্তি; কারণ, অর্দ্ধেক পাক হইবে, অর্দ্ধেক আত্মসেবার জন্য থাকিবে।

কোথাও বা দারুণ বঁটির আঘাতে মৎস্যকুল ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল, কোথাও বা বালক-বালিকার দল মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। পুরসুন্দরীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত করিতেছিলেন; মলের শব্দ কোথাও ঝনাৎ ঝনাৎ, কোথাও রুণ্ রুণ্, কোথাও বা ঠুনু ঠুনু; যার যেমন বয়স, তার মলও তেমনই বাজিতেছিল। কখন বা বামাস্বরে রামী বামী শ্যামীর ডাক পড়িতেছিল। পাড়ার গোটা দুই অধঃপেতে ছেলে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছিল। কতকগুলিন বালিকা কলরব করিয়া আগডুম বাগডুম খেলিতেছিল।

মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে, কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইবে, এমত ভরসা রহিল না। তিনি অষ্টমে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বলি, মাগীরা একটু থাম্‌বি।" এই বলিয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা বালকদ্বয়ের মধ্যে একজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া দুই-চারি চপেটাঘাত করিলেন।

একেবারে আগুনে জল পড়িল;—ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজিতে সকলই তিরোহিত হইল। যে স্থূলাঙ্গিনী আকাশকে সম্বোধন করিয়া বিবিধ চীৎকার ও মুখভঙ্গী করিতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধনির্গত চীৎকার অমনি কণ্ঠেই রহিয়া গেল, হস্তিনীর ন্যায় আকারখানি কোথায় যে লুক্কায়িত হইল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না; সম্মার্জ্জনীহস্তে যিনি বিবসনে বিষম ব্যাপার করিতেছিলেন, তিনি অমনি করস্থ ভীম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীন মাংসরাশি কোথায় লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ-কোণ ও-কোণ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মেঝেতে কে জল ফেলিয়াছিল—পরিচারিকা দ্রুতপদে বিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া চীৎপাত হইয়া ভূ-শায়িনী হইলেন; যিনি পাত্রাদি মার্জ্জনে হাত মুখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাচিকার পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহার একটা লম্বা গালির ছড়া আধখানা বই বলা হইল না—হাত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উঁচু হইয়াছিল, তেমনই উঁচু রহিয়া গেল; মৎস্যদল-দলনী বারেক নিস্তব্ধ হইলেন, পশ্চাৎ কার্য্যারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদৃশ ঘটা রহিল না; রন্ধনশালার কর্ত্রী যে ঘৃতের কারণ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপরা হইলেন—অন্যমনস্কপ্রযুক্তই হউক, আর তাড়াতাড়িতে বিবেচনার অভাববশতই হউক, পাচিকা পলায়নকালে পূর্ণভাণ্ড ঘৃত লইয়া চলিয়া গেল—

পাচিকা ইতিপূর্ব্বে কেবল অর্দ্ধভাগু মাত্র ঘৃতের প্রার্থিতা ছিলেন; যে পুর-সুন্দরীরা প্রদীপহস্তে কক্ষে কক্ষে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে ত্রস্তে পলাইয়া লুক্কায়িত হইলেন, পলায়নকালে মলগুলি একেবারে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—হস্তের দীপসকল নিবিয়া গেল।

যে শিশু মল্লযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরত্বের এমত নূতনতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকচ মৃত্যুকালেও পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই পলায়নকালে বিপক্ষের উরুদেশে একটি পদাঘাত করিয়া গেলেন। যে বালিকাগণ কলরব-সহকারে খেলিতেছিল, তাহারা খেলা ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—ভয় হইয়াছে, কিন্তু হাসিটা একেবারে থামিল না। যে অন্তঃপুর এত ক্ষণ অতি ঘোর কোলাহলপরিপূর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব। কেবল মাত্র গৃহিণী—অবিকৃত কান্তিমতী হইয়া—বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মাধব তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!"

মাসী মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা।"

মাধব কহিলেন, "খুড়ী কোথা, মাসী?"

উত্তর—"আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, আজ সকাল বেলা হ'তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই।"

মাধব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "সকাল অবধি নাই! তবে সকলই সত্য!"

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সত্য বাপু?"

মাধব। কিছু না—পশ্চাৎ বলিব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে কি তাঁহার আজও দেখা হয় নাই?

গৃহিণী ডাকিয়া কহিলেন, "অম্বিকা, শ্রীমতী! তোরা কেহ দেখেছিস?"

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, "না।"

মাধব কহিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।"

পরে অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদু স্বরে কহিল, "আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাঁকে দেখেছিলাম।"

মাধব অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!"

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "তবে কি মথুর দাদার কর্ম্ম? না, না, তা হ'তে পারে না—আমি অন্যায় দোষ দিতেছি।" পরে প্রকাশ্যে

কহিলেন, "করুণা, তুই বড় বাড়ীতে যা,—খুড়ীকে ডেকে আন্; যদি না আসেন, তবে কেন আস্‌বেন না, জিজ্ঞাসা করিস্।"

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামিকৃত তিরস্কারের পর শ্বশ্রূস্বসা কর্ত্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত হইলে কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন করিলেন। রাত্রে পাকাদি সমাপন হইলে শ্বশ্রূস্বসা তাঁহাকে আহারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী শয্যাত্যাগ করিলেন না। ননন্দা কিশোরী আসিয়া পিতৃস্বসার সংযোগে অনেক অনুনয় সাধনাদি করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন,—মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন।

মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনীর প্রতি রুষ্ট হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অদ্য রাত্রে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে জানিতেন।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সর্ব্বত্র নীরব হইল। মাতঙ্গিনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্ধ্রের আচ্ছাদনীর পার্শ্ব হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল; তদ্ধেতু কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্র অন্ধকার।

প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত তীক্ষ্ণ যে, যত ক্ষণ না তৎসম্বন্ধীয় বিষময়ী স্মৃতি বিলেপিতা হয়, তত ক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না। গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থল হইতে অঞ্চল পদতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপাধান-ন্যস্ত বাম ভুজোপরে শিরঃ সংস্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনী চন্দ্রপাদরেখা প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কেন? সে অমৃত শীতল কিরণ দৃষ্টে কত যে পূর্ব্বসুখ স্মৃতি-পথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কৈশোরে কত দিন প্রদোষকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে এক শয্যায় শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরঞ্জিনী উপকথা কথন বা শ্রবণ করিতে করিতে নীলাম্বরবিহারী এই নিশানাথ প্রতি চাহিতে থাকিতেন, তাহা মনে পড়িল। নীলাম্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতিঃ বর্ষিত হইয়া কত যে হৃদয়-তৃপ্তি জন্মাইত, একবৃন্তোৎপন্ন কুসুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা তখন কত যে আন্তরিক সুখে উচ্চ হাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পড়িতে লাগিল।

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চ হাস্য আর কাহার কণ্ঠে? সেই সকল প্রিয়জনই বা কোথায়? আর কি তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন? আর কি তাঁহাদের সেই স্নেহপূর্ণ সম্বোধন কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে? মনঃপীড়াপ্রদান-পটু স্বামীর হস্তজ্বালিত কালাগ্নি অন্তর্দাহ ব্যতীত আর কিছু কি অদৃষ্টে আছে?

এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি গূঢ় বৃত্তান্ত জাগিতেছিল। সে চিন্তা অনুতাপময়ী হইয়াও পরম সুখকরী। মাতঙ্গিনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বহিষ্কৃত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। এই গূঢ় ব্যাপার কি, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মন্থন করিয়া তৎস্মৃতিলাভে মাতঙ্গিনী কখন মনে করিতেন, রত্ন পাইলাম; কখন বা ভাবিতেন, হলাহল উঠিল। রত্নই হউক, আর গরলই হউক, মাতঙ্গিনী ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘটিতে পারে না। চক্ষুর্দ্বয় বারিপ্লাবিত হইল।

ক্রমে গ্রীষ্মাতিশয্য দুঃসহ হইয়া উঠিল; মাতঙ্গিনী গবাক্ষ-রন্ধ্র মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। মুক্ত করেন, এমত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ পদসঞ্চারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসিতেছিল—এমত লঘু শব্দ তাঁহার কর্ণপ্রবিষ্ট হইল।

জানেলাটি যেমত সচরাচর এরূপ গৃহে ক্ষুদ্র হয়, তদ্রূপই ছিল,—দুই হস্ত মাত্র দৈর্ঘ্য, সার্দ্ধৈক হস্ত মাত্র বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেষ্টনীই সর্ব্বত্র প্রথা। রাজমোহনের গৃহেও সেইরূপ ছিল; এবং জানেলার ঝাঁপ ব্যতীত কাষ্ঠের আবরণী ছিল না।

পার্শ্বে যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, পদসঞ্চার শ্রবণে ভীতা হইয়া মাতঙ্গিনী সেই ছিদ্র দিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলাম্বরস্পর্শী বৃক্ষশ্রেণীর শিরোভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

মাতঙ্গিনী জানিতেন, যে দিক্ হইতে পদসঞ্চারশব্দ তাঁহার কর্ণগত হইল, সে দিক্ দিয়া মনুষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই; সুতরাং আশঙ্কা জন্মান বিচিত্র কি? মাতঙ্গিনী নিস্পন্দ শরীরে কর্ণোত্তোলন করিয়া তথায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।

ক্রমশঃ পদক্ষেপণশব্দ আরও নিকটাগত হইল; পরক্ষণেই দুই জন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন করিতেছে শুনিতে পাইলেন। দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন; তাঁহার ত্রাস ও কৌতূহল দুই সম্বর্দ্ধিত হইল। যথায় মাতঙ্গিনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক ব্যক্তিরা বিরলে কথোপকথন করিতেছিল, তন্মধ্যে

দরমার বেষ্টনীমাত্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং মাতঙ্গিনী কথোপকথনের অনেক শুনিতে পাইলেন ; আর যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মর্ম্মার্থ অনুভবে বুঝিতে পারিলেন না।

এক ব্যক্তি কহিতেছিল, "অত বড় বড় করিয়া কথা কহ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে যে শুনিতে পাইবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, "এত রাত্রে কে জাগিয়া থাকিবে?"

মাতঙ্গিনী কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, এ কথা রাজমোহন কহিল।

প্রথম বক্তা কহিল, "কি জানি, যদি কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাঁড়াইলে ভাল হয়।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "বেশ আছি : যদি কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছেঁচের ছায়ার মধ্যে কেহ আমাদিগকে ঠাওর পাবে না, বরং সরিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাবে।"

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে কে থাকে?"

দ্বিতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর করিল, "সে কথায় দরকার কি?"

প্র, ব। বলিতেই বা ক্ষতি কি?

দ্বি, ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না।

প্র, ব। তুমি ঠিক জান ত, তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে?

দ্বি, ব। বোধ করি ঘুমাইয়াছে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিতেছি, তুমি এখানে ক্ষণেক দাঁড়াও।

মাতঙ্গিনী পুনরায় পদক্ষেপণশব্দ শুনিতে পাইলেন ; বুঝিলেন, রাজমোহন বাটীর ভিতর আসিতেছে। মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে গবাক্ষসন্নিধান হইতে সরিয়া শয্যায় আসিলেন ; এবং এমত সাবধানে তদুপরি আরোহণ করিলেন যে, কিঞ্চিৎমাত্র পদশব্দ হইল না। তথায় নিমীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভিভূতার ন্যায় রহিলেন।

রাজমোহন আসিয়া দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। পত্নী আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল না। তখন রাজমোহন মৃদু স্বরে মাতঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল ; তথাপি দ্বারোন্মোচিত হইল না। রাজমোহন বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। তথাপি কি জানি, যদি এমনই হয় যে, মাতঙ্গিনী সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে অভিমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যত্ন করিল। পাকশালায় গমন করিয়া তথাকার প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল ; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখিয়া, এক পদে দ্বিতীয় কপাট ঠেলিয়া ধরিল ;— এইরূপে দুই কপাটমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, মাতঙ্গিনী, রাজমোহন স্বেচ্ছামত শয়নাগারে প্রবেশ করিতে

পারে, এই অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র কাষ্ঠের "খিল" দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। রাজমোহন অনায়াসে "খিল" বাহির হইতে উদ্ঘাটিত করিল, এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজমোহন দেখিল যে, মাতঙ্গিনীর মুখকান্তি যথার্থ সুষুপ্তি-সুস্থিরের ন্যায় রহিয়াছে। বার কয়েক তাঁহাকে ডাকিল; কোন উত্তর পাইল না। যদি পত্নী অভিমানে নিরুত্তরা থাকে, তবে অভিমান ভঞ্জনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল; তথাপি মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ রহিয়াছেন ও ঘন ঘন গভীর শ্বাস বহিতেছে দেখিয়া মনে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। সে নিদ্রার ছল করিবে কেন? অতঃপর নিঃসন্দিগ্ধমনে পূর্ব্বকৌশলে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য কক্ষদ্বারে গমন করিল। দ্বারে দ্বারে সকলকে মৃদু স্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না; সুতরাং সকলেই নিদ্রামগ্ন বিবেচনায় রাজমোহন প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির নিকট গমন করিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাতঙ্গিনী পুনর্ব্বার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষসান্নিধ্যে গমন করিলেন; এবং নিম্নোদ্ধৃত মত কথোপকথন শ্রবণ করিলেন।

সকলেই নিদ্রিত, এ সংবাদ রাজমোহনপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কহিল, "তুমি আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছ?"

রাজমোহন কহিল, "বড় নহি—আমি কিন্তু তা বলিয়া ভালমানুষির বড়াই করিতেছি না; তবু নেমকহারামি; আমি লোকটাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার উপকার অনেক করিয়াছে।"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "উপকার করিয়াছে, তবে দেখিতে পার না কেন?"

রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে। আমার ভাল কর, কর—না কর, না কর,—সে তোমার ইচ্ছা; কিন্তু আমায় যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই।

অপরিচিত। তবে আর নেমকহারামি কি? আমাদের কাজে লাগিবে?

রাজ। লাগি, যদি যা চাই, তাই দাও। আমার ইচ্ছা, এখানকার বাস উঠাই—ওর কাছে না থাকিতে হয়। কিন্তু যাই কি নিয়ে—হাত খালি; দেশে গেলে বাঁচি কি মরি। তাই আমি এমন এক হাত মারিতে চাই যে, সেই টাকায় অন্যত্র আমার কিছু কাল গুজরাণ হয়। যদি তোমাদের এ কর্ম্মে এমন হাত মারিতে পারি, তা হ'লে লাগিব না কেন? লাগিব।

অপ। আচ্ছা, কি নেবে বল ?

রাজ। তুমি আগে বল দেখি, আমায় কি করিতে হইবে ?

অপ। যাহা বরাবর করেছ, তাহাই করিবে ; মাল বই করিয়া দিবে। এইবার মনে করিতেছি যে, নগদ ছাড়া যা কিছু পাইব, তা তোমার কাছে রেখে যাব।

রাজ। বুঝেছি, আমি নইলে তোমার কাজ চলিবে না। তোমরা বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা কর্ম্ম হইলে এ দিকেও বড় গোলযোগ হইয়া উঠিবে ; রাঁড়ী বাল্‌তির বাড়ী নয় যে, দারোগা বাবু কিছু প্রণামী লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাসির বাড়ীতে বসিয়া ইয়ারকি মারিবে। একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম-সকমই হইয়া উঠিবে ; তাহা হইলে সোনা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে ত হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যত দিন না লেঠাটা মিটে, তত দিন আমার কাছে সব থাকে। তা বড় মন্দ মতলব নয় ; আর আমারও এমত যুত বরাত আছে যে, কোন শালা খড়্‌কে গাছটিও টের পাবে না। বিশেষ আমি ভায়রা-ভাই, আমাকে কোন্ শালা শোবে কর্‌বে ? অতএব আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে বনিয়া উঠা ভার।

অপ। যদি ভাই এতই বুঝিতেছ, তবে কেন বনাইয়া লও না।

রাজ। আমি দশ কথা পাঁচ কথার মানুষ নই ; প্রাণ চায় দাও—না হয়, আপনার কর্ম্ম আপনি কর—সিকি ভাগ চাই।

দস্যু ভালরূপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক, অপহৃত দ্রব্যের চতুর্থাংশের ন্যূন সে সহায়তা করিতে স্বীকার হইবে না ; অতএব বাক্যব্যয় বৃথা। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি সম্মত হইলাম। তাদের একবার জিজ্ঞাসার আবশ্যক ; তা তারা কিছু আমার মতছাড়া হবে না।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "তাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু আর একটা কথা আছে। যা আমার কাছে থাকিবে, তার আমরা একটা মোটামুটি দাম ধরিব ; ইহারই সিকি তোমরা আমাকে নগদ দিয়া যাবে ; তার পর মহাজনে কম দেয়, আমি কম্‌তির সিকি ফেরত দিব, আর বেশী দেয়, তোমরা আমাকে বেশীটা দেবে।"

দস্যু। তাই হবে ; কিন্তু আমারও আর একটি কথা আছে। তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে।

রাজ। আর এক মুঠো টাকা।

দস্যু। তা ত বটেই। আমরা মাধব ঘোষের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিব, সে কেবল আমাদের আপনাদেরই জন্য ; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে।

রাজমোহন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ?"

দস্যু। তাহার খুড়ার উইলখানা চাই।

রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, "হুঁ।"

দস্যু কহিল, "হুঁ, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে, আমরা তা জানি না। আমরা ত সমস্ত রাত্রি কেবল কাগজ উট্‌কাইয়া বেড়াইতে পারব না। কোথায় আছে, সে খবরটা তুমি অবশ্য জান।"

রাজ। জানি; কিন্তু কাহার জন্য উইল চাই?

দস্যু। তাহা কেন বলিব?

রাজ। কেন, আমাকেও বলিবে না?—আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক?

দস্যু। তোমাকেও বলিতে বারণ।

রাজ। মথুর ঘোষ?

দস্যু। যেই হউক—আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে দেব।

রাজ। আমারও ঐ কথা।

দস্যু। উইল পাব কোথায়?

রাজ। আমায় কি দিবে বল?

দস্যু। তুমিই বল না।

রাজ। পাঁচ শত খানি দিও; তোমরা পাবে ঢের, দিলেই বা।

দস্যু। এটা বড় জিয়াদা হইতেছে; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে সিকি দিই কেমন করে।

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা।

দস্যু পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই সই; আমার ঢের কাজ আছে, আমি কাগজ হাঁটকিয়া বেড়াইলে চলিবে না। নয়ত কোনও ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে পড়িবে, আর পুড়াইয়া ফেলিবে—পাঁচ শতই দেব।"

রাজ। মাধবের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজ-আলমারি আছে; তাহার সব নীচের দেরাজের ভিতর একটা বিলাতী টিনের ছোট বাক্‌সতে উইল, কবালা খত ইত্যাদি রাখিয়া থাকে; আমার গোপন খবর জানা আছে।

দস্যু। ভাল কথা; যদি এ লেঠা চুকিল, তবে চল জুটি গিয়া। কর্ম্ম হইয়া গেলে যেখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে। এস, আর দেরি করে কাজ নেই; চাঁদ্‌নি ডুবিলে কর্ম্ম হবে—এখনকার রাত ছোট।

এই কহিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী বিস্মিতা ও ভীতি-বিহ্বলা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ

মাতঙ্গিনী অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শুনিয়াছিলেন। এই বিষম কু-সঙ্কল্পকারীদিগের মুখ-নির্গত যতগুলিন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগুলিন বজ্রাঘাত তাঁহার বোধ হইয়াছে। যত ক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াছিল, তত ক্ষণ বসন্ত-বাতাহত অশ্বথ-পত্রের ন্যায় তাঁহার ভীতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল; কিন্তু কথা সমাপ্তি হইবামাত্র মাতঙ্গিনী আত্ম-বিবশা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ ত্রাস ও উৎকট মানসিক যন্ত্রণার আধিক্য প্রযুক্ত বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন; ক্রমে মনঃস্থির হইলে দৈব-প্রকাশিত এই বিষম ব্যাপার মনোমধ্যে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নিজ ভর্ত্তাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন না; আজ তাঁহার চক্ষুরুন্মীলিত হইল। চক্ষুরুন্মীলনে যে করাল মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাতে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে ভাবিতেন যে, বিধাতা তাঁহাকে ক্রোধ-পরবশ দুর্নীত ব্যক্তির পাণিগৃহীতা করিয়াছেন; আজ জানিলেন যে, তিনি দস্যুপত্নী—দস্যু তাঁহার হৃদয়-বিহারী।

জানিয়াই বা কি? দস্যু-স্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি? স্ত্রী-জাতি—পতিসেবাপরায়ণা দাসী—পতিত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরদিন দস্যুপদে দেহ-রত্ন অর্পিত হইবে—গরলোদ্গীর্ণমান বিষধর হৃদয়-পথে আসীন থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বলিয়া কখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লিপি বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে?

মাতঙ্গিনী ক্ষণেক কাল এইরূপ চিন্তা করিলেন; পরক্ষণেই যে দস্যুদল-সঙ্কলিত দারুণ প্রমাদ ঘটনা হইবে, তাহাই মনোমধ্যে প্রখর তেজে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আর কাহারই বা এই সর্ব্বনাশ ঘটনা হইবে? হেমাঙ্গিনীর সর্ব্বনাশ, মাধবের সর্ব্বনাশ! মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চ কণ্টকিত,—শোণিত শীতল হইতে লাগিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। যখন ভাবিলেন যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নির্জ্জন নিশীথে হৃদয়বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুষুপ্তিসুখানুভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্র্য-রাক্ষসী তাহার পশ্চাতে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে; হয়ত ধনহানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইবে, তখনই মাতঙ্গিনীর নিজ সম্বন্ধীয়

মর্ম্মব্যথক ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে স্থির বুঝিলেন যে, আমি না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাও করিব।

মাতঙ্গিনী প্রথমোদ্যমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তর্হিত হইল; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। কেন না, রাজমোহনের আত্মপরিবার এমত অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না; বিশ্বাস করিলেও মাধবের উপকারার্থ রাজমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইবেক না। বরং লাভের মধ্যে তাহারা রাজমোহনের নিকট মাতঙ্গিনীকে এতদ্বিষয়ের সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত করিলে মাতঙ্গিনীর মহাবিপদ্ সম্ভাবনা।

পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন যে, কেবল কনককে জাগ্রত করিয়া তাহাকে সকল সংবাদ অবগত করান; এবং যাহা উচিত হয়, পরামর্শ করেন। তদভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। কনকের গৃহ সন্নিকট। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে কনকের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রালোকে পৃথিবী প্রফুল্লিতা। মাতঙ্গিনী কনকের গৃহ-দ্বারে উপনীতা হইয়া ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, "কে, রে?"

সর্ব্বনাশ! কনকের মাতা অতিশয় মুখরা, মাতঙ্গিনীর এ কথা স্মরণই ছিল না। মাতঙ্গিনী ভয়ে নিঃশব্দ রহিলেন। কনকের মাতা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?" "কে রে?"

মাতঙ্গিনী সাহস করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমি গো।"

কনকের মাতা কোপযুক্ত স্বরে কহিল, "কে?—রাজুর বৌ বুঝি, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা?"

মাতঙ্গিনী মৃদু স্বরে বলিলেন, "কনককে একটা কথা বলিব।"

কনকের মাতা বলিল, "রাত্রে কথা কি আবার একটা? সারাদিন কথা কয়ে কি আশ মেটে না? ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি গা? বউ-মানুষ, এখনই এ সব ধরেছ?—চল দেখি তোমার পিশেসের কাছে।"

মাতার তর্জ্জন গর্জ্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বৃত্তান্ত বুঝিয়া কনক কহিল, "মা, দুয়ারটা খুলে দাও, শুনিই না কি বলে।"

কনকের মাতা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখ্ কন্‌কি, এমন মুড়ো ঝাঁটা তোর কপালে আছে।"

কনক নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ হইল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, "কি করি? কেমন করে তাদের রক্ষা হয়? কে সংবাদ দিবে?—কে এ রাত্রে যাইবে? আমি আপনিই যাই, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।" পরক্ষণে ভাবিলেন,—"কেমন করিয়া যাইব? লোকে কি বলিবে? মাধব কি মনে করিবে? শুধু তাহাই নহে, স্বামী জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘটিবে। তাহা হউক—লোকে যাই বলুক—মাধব যাহা হয় মনে করুক—স্বামী যাহা করে করুক, তজ্জন্য মাতঙ্গিনী ভীতা নহে।"

কিন্তু মাতঙ্গিনী যাইতে সাহস করিলেন না। এ গভীর নিশীথকালে, এই নিস্তব্ধ বনান্ত পথ, তাহাতে আবার একাকিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালাবধি ভৌতিক উপন্যাস শ্রবণে হৃদয়মধ্যে ভৌতিক-ভীতি বিষম প্রবলা। পথ অতি দুর্গম। তাহাতে আবার দস্যুদল কোথায় জটলা করিয়া আছে; যদি তাহাদের করকবলিত হয়েন? এই কথা স্মৃতিমাত্র ভয়ে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি দস্যুদলমধ্যে মাতঙ্গিনী স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিতা হয়েন? এই ভয়ে মাতঙ্গিনী পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

স্বভাবতঃ মাতঙ্গিনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন। যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে সাহস বিরাজ করে। প্রিয়তমা সহোদরা ও তৎপতির মঙ্গলার্থ মাতঙ্গিনী প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হইলেন। যেমন উপস্থিত বিপত্তির বিকট মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনীরও হৃদয়গ্রন্থি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল—তখন অগাধ প্রণয়-সলিলে ভাসমান হইয়া বলিলেন, "এ ছার জীবন আর কি জন্য? যদি এ সঙ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই এ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক, তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না করি কেন? আমার ভয় কি? প্রাণনাশাধিক বিপদ্ও ঘটিতে পারে; জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।"

কিন্তু মাধবের বাটীতে এ নিশীথে একাকিনী কি প্রকারেই যান? মাতঙ্গিনীর চিন্তাকুলতা সহনাতীত হইল।

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসম্বর্দ্ধিত গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রতীকার হেতু জালরন্ধ্রসন্নিধানে গিয়া জালাবরণী উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন যে, বিটপিশ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ঘাকৃত হইয়াছে—অস্তাচলাভিমুখী নিশাললাটরত্ন প্রায়-দিগন্তব্যাপী বৃক্ষশিরোরাজির উপরে আসিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ আলোক বর্ষণ করিতেছেন। আর দুই চারি দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে; তখন আর হেমাঙ্গিনীকে

রক্ষা করিবার সময় থাকিবে না। বিপদ্ একেবারে সম্মুখে দেখিয়া মাতঙ্গিনী আর বিলম্ব করিলেন না।

মাতঙ্গিনী ঝটিতি এক খণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবরিত করিলেন, এবং কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপূর্ব্বে রাজমোহন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনীও তদ্রূপ করিলেন।

গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতঙ্গিনী ঊর্দ্ধে অসীম নীলাম্বর, চতুর্দ্দিকে বিজন বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ নিস্পন্দ শিরঃশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পুনর্ব্বার সাহস দ্রবীভূত হইয়া গেল—হৃদয় শঙ্কাকম্পিত হইল—চরণ অচল হইল। মাতঙ্গিনী অঞ্জলিবদ্ধ করে ইষ্টদেবের স্তব করিলেন। হৃদয়ে আবার সাহস আসিল; তিনি দ্রুত-পাদবিক্ষেপে পথ বহিয়া চলিলেন।

বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র নিঃশব্দ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপশব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ শিহরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুঁড়ি ছিল, প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে নরঘ্ন প্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। যে যে স্থলে তমসা নিবিড়তর, সেই সেই স্থানে দুরন্ত ভূতযোনি বা দস্যুর প্রচ্ছন্ন শরীরের ছায়া মাতঙ্গিনীর চক্ষুর্জ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। বাল্যকালে যত ভৌতিক উপন্যাস শ্রুত হইয়াছিল, নিশীথ পান্থের গহনমধ্যে বিকট পৈশাচ দংষ্ট্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বিহ্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করার যে সকল উপকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাঁহার স্মরণপথে আসিতে লাগিল।

যদিও কোথাও শাখাচ্যুত শুষ্কপত্র-পতনশব্দ হইল, যদি কোনও শাখারূঢ় নৈশ বিহঙ্গ পক্ষস্পন্দ করিল, যদি কোথাও শুষ্কপত্রমধ্যে কোন কীট দেহ সঞ্চালন করিল, অমনি মাতঙ্গিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন; তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণী, কখন বা ইষ্টদেব নামজপ কখন বা প্রিয়জনগণের বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে চঞ্চলপদে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন।

ভয়সঙ্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের এক পার্শ্বে বৃহৎ আম্র-কানন, অপর পার্শ্বে এক দীর্ঘিকার পাহাড়। বন্য উচ্চভূমিখণ্ডমধ্যে পথ অতি সঙ্কীর্ণ; তদুপরি দীর্ঘিকার উপর প্রকাণ্ডাকার কতিপয় বটবৃক্ষের ছায়ায় চন্দ্রালোকের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং

এই স্থানে পথান্ধকার নিবিড়তর। দীর্ঘিকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন।

মাতঙ্গিনী ভীতি-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আম্র-কাননের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতেছিল, এবং অস্ফুটস্বরে বহু ব্যক্তির কথোপকথনের শব্দও মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল।

মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। এই আম্র-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে। দুঃসময়ে বিপদ্ এক প্রকারে কেবল উপস্থিত হয় না;—পথিমধ্যে একটা কুকুর শয়ন করিয়াছিল, নিশাকালে পথিক দেখিয়া উচ্চ রব করিতে লাগিল। আম্র-কাননের কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুর-শব্দে দুরাত্মারা লোক-সমাগম অনুভূত করিয়াছে; অতএব শীঘ্রই তাহারা কাছে আসিবে। আসন্নকালে মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ গমনে দীর্ঘিকার জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আম্র-কানন বা পথ হইতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যদি দস্যুরা দীর্ঘিকার তটারোহণ করিয়া পথিকের অন্বেষণ করে, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে এমত কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ছিল না যে, তদন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসন্ন বিপদে মাতঙ্গিনীর ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যতৎপরতা বিশেষ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণমধ্যে মাতঙ্গিনী জলতীরস্থ এক খণ্ড গুরুভার আর্দ্র মৃৎখণ্ড উত্তোলন করিয়া অঙ্গস্থ শয্যোত্তরচ্ছদের মধ্যে রাখিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিলেন। অনায়াস-গোপনযোগ্য পরিধেয় শাটী মাত্র অঙ্গে রাখিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এক্ষণে পুষ্করিণীর পাহাড়ের অপর দিকে মনুষ্যকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল; এবং মনুষ্যপদসঞ্চালনশব্দও নিঃসন্দেহে শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী ঈদৃশ সাবধানতার সহিত শয্যোত্তরচ্ছদ জলমগ্ন করিলেন যে, জলশব্দ না হয়। বস্ত্রখণ্ড মৃৎখণ্ডের গুরুভারে তলস্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইল। মাতঙ্গিনী এক্ষণে ধীরে ধীরে জলমধ্যে অবতরণ করিয়া অন্ধকারবর্ণ স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে যথায় কথিত বটবিটপীর ছায়ায় প্রগাঢ়তর অন্ধকার হইয়াছিল, তথায় অধর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছু জলের উপর জাগিতেছিল না। তথাপি কি জানি, যদি সেই মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ সে নিবিড় অন্ধকারমধ্যে কেহ লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় মাতঙ্গিনী নিজ কবরীবন্ধনী উন্মোচন করিয়া কোমলাকুঞ্চিত কুন্তলজাল মুখের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই ঘনান্ধকারবর্ণ সরসীজলের উপরে, ঘনতর বৃক্ষ-ছায়াভ্যন্তরে যে নিবিড় কেশদাম ভাসিতেছিল, তাহা মনুষ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব। পরক্ষণেই কথোপকথনকারীরা দীর্ঘিকা-তট অবতরণ করিয়া অর্দ্ধপথ

আসিল। মাতঙ্গিনী তাহাদের কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহাদের পানে যে চাহিয়া দেখিবেন, এমত সাহস হইল না।

আগন্তকদের মধ্যে একজন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল, "এ ত বড় তাজ্জব! আমি সঠিক বলিতেছি, আমি বেশ দেখিয়াছিলাম, এই পথের উপর একটা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতেছিল; বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি দেখিয়াছিলাম।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "গাছপালা দেখে তোর ধাঁধাঁ লেগে থাক্‌বে; অপদেবতা টেবতাই বা দেখে থাক্‌বি। এত গর্‌মিতে মানুষে কাপড় মুড়ি দিয়ে বেড়াবে কেন?"

"হবে" বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; আশঙ্কার মূল কারণ যে ভীতিবিহ্বলা অবলা, তাঁহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না।

দস্যুরা কিছু দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল। যত ক্ষণ তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল, তত ক্ষণ মাতঙ্গিনী জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন বিবেচনা হইল যে, আর তাহাদের দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন জল হইতে উঠিয়া গমনোদ্যোগিনী হইলেন।

মাতঙ্গিনী যে পথে গমনকালীন এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কাক্রমে এবার সে পথ ত্যাগ করিলেন। পুষ্করিণীর তীর পরিবেষ্টন করিয়া অপর দিকে আর এক পথে উঠিলেন। মধুমতী যাইতে মাতঙ্গিনীর নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু পুষ্করিণী নিষিদ্ধ ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে আহ্নিক স্নানাদি ক্রিয়ার্থ এই জলে আসিতেন। সুতরাং এ স্থানের সকল পথ উত্তমরূপে চিনিতেন। পুষ্করিণীর অন্য এক পাহাড়ে উঠিয়া অন্য এক পথ অবলম্বন করিলে যে পূর্ব্বাবলম্বিত পথে পড়িতে হয়, অথচ আম্র-কাননের ধারে যাইতে হয় না, ইহা এই সময়ে মাতঙ্গিনীর স্মরণ হইল। বৃক্ষলতাকণ্টকাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ এই পথ অতি দুর্গম, কিন্তু মাতঙ্গিনীর পক্ষে কণ্টকাদির বিঘ্ন, তুচ্ছ বিঘ্ন। অলক্তক পরিবর্ত্তে কণ্টক-বেধ-বাহিত রক্তধারা চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতে লাগিল। এক দিকে গুরুতর সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠা, অপর দিকে দস্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ব্যগ্রতা; এই উভয় কারণে মাতঙ্গিনী তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া কণ্টকলতাদি পদদলিত করিয়া চলিলেন। কিন্তু এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল;—মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে আসিয়া অবধি দুই তিন বার মাত্র সহোদরাবল্লভ মাধবের আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পদব্রজে একবারও গমন করেন নাই। সুতরাং এদিকের পথ তাঁহার তেমন জানা ছিল না। এক্ষণে মাতঙ্গিনী চতুর্দ্দিক্‌বাহী পথ-সন্নিধানে উপনীতা হইয়া কোন্ পথে যাইবেন, তাহা অবধারণে অক্ষম হইলেন। মাতঙ্গিনী পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে মাধবের অট্টালিকার সম্মুখ-রোপিত দেবদারু-শ্রেণীর শিরোমালা নয়নগোচর হইল। দৃষ্টিমাত্র

হর্ষিতচিত্তে তদভিমুখে চলিলেন ; এবং সত্বর অট্টালিকার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথাপি মাতঙ্গিনীর ক্লেশের চূড়ান্ত হইল না। এ নিশীথে বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে? অনেক বার করাঘাত করিয়া মাতঙ্গিনী পুরকিঙ্করী করুণাকে নিদ্রোত্থিতা করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, "এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায় ?"

মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে কহিলেন, "শীঘ্র—শীঘ্র—করুণা, দ্বার খোল।" নিদ্রাভঙ্গকরণ-অপরাধ অতি গুরুতর ; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? করুণার ক্রোধোপশম হইল না, পূর্ব্ববৎ পরুষ বচনে কহিল, "তুই কে যে, তোকে আমি তিন পর রেতে দোর খুলে দেব ?"

মাতঙ্গিনী সস্পষ্টে আপন নাম ডাকিয়া কহিতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ; অতএব পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন, "তুমি এস, শীঘ্র এস গো, এলেই দেখতে পাবে।"

করুণা সম্বর্দ্ধিত রোষে কহিল, "তুই কে বল্ না, আ মরণ !"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ !"

তখন করুণার স্থূল বুদ্ধিতেও একটু একটু আভাস হইল যে, চোর ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর প্রায় দেখা যায় না। অতএব আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "এ কি! তুমি! তুমি ঠাকুরাণী !"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করিব—বড় দরকার ; শীঘ্র আমাকে হেমের কাছে লইয়া চল।"

# নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি ? ভূত আছে ?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল—একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল।

সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া, বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic ? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত আছে'—আমার বলিলেই হইত "না।" আমি বলিয়াছি, "ভূত ? না।" "ভূত ?" কথাটা বেশী বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, "seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না ?"

সারি। না।

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না ?

সারদা। সেই প্রাচীন ঋষির কথা—প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না—আর আমি প্রমাণ-অভাবে ভূত মানিব ?

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সৎকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ করিল।

বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল—বলিল, "কোথাকার বাঁদর ? ভূত নাই!—ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই ?"

সারি। তাই বটে। তোমার মটন রোষ্ট ফুরাইল, দেখিয়া, আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয় তুমিও নেই।

বরদা, "কই, খেলি কই ?" এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া, গ্লাসে সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যত ক্ষণ মাংসের ছেদন, বিদ্ধন, মুখে উত্তোলন, এবং চর্ব্বণ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত, তত ক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল। পরে অবসর পাইলে, সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল, "তুমি নাই, আর আমি নাই—ইহা প্রায়

philosophically true—কেন না, আমরা "mere permanent possibilities of sensation." আর এই যে আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে,—কেবল সেই possible sensationগুলার মধ্যে কতকগুলা sensation হইল মাত্র।

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা, এ সব possible sensation নহে ?

সারদা। ভূত থাকিলে possible.

বর। ভূত নাই ?

সার। তা ঠিক বলিতেছি না—তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে ?

সার। আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বর। টেম্‌স্ নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ ?

সার। না।

বর। টেম্‌স্ নদী আছে মান ?

সার। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বর। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সার। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে ? এক জনের নাম কর দেখি ?

বর। মনে কর, আমি।

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সার। তুমি ?

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর।

সার। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জুকে সর্প ভ্রম হইতে পারে।

বর। তুমি দেখিবে ?

সার। দেখিব না কেন ?

বর। আচ্ছা, তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।—'নারায়ণ,' বৈশাখ ১৩২২, পরিশিষ্ট।

# ভিক্ষা

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি, এ যাত্রা ভিক্ষা করিয়া কাটাইব। আমাদের দেশ—ভাল দেশ, ভিক্ষায় বড় মান; যে নির্ব্বোধ, সে পরিশ্রম করুক, আমি ভিক্ষা করিব।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি বধির, কি পীড়িত, কি দীন-দুঃখী। এ দেশে ভিক্ষা করিতে সে সব আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ভিক্ষা করিলেই হইল।

কে ভিক্ষা না করে? দীন-হীন, ধনবানের নিকট ভিক্ষা করে, ধনবান্‌ও দীন-হীনের নিকট ভিক্ষা করে। বড় বড় প্রকাণ্ডোদর জমিদারেরা দুঃখী প্রজাদের কাছে ভিক্ষা করেন; আজ পিতৃশ্রাদ্ধ, কাল পুত্রের যজ্ঞোপবীত, তার পরদিন কন্যার বিবাহ। প্রজার নিকট ভিক্ষা না করিলে এ সব কর্ম্মে মান থাকে কই? বড় বড় কুলীন, তাঁহারা স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা করিয়া উদর পরিপূরণ করেন, নহিলে নবধা কুললক্ষণ উজ্জ্বল হয় না। বড় বড় অধ্যাপক আচার্য্য গোস্বামীরা ভিক্ষা করেন, নহিলে পরকালের কাজ হয় না। তাঁহারা একান্ত পরহিতৈষী সন্দেহ নাই।

কে ভিক্ষা না করে? আমাদের দেশে সকলেই ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষুক বিশেষে আর ভিক্ষার সময় বিশেষে, ভিক্ষার বিশেষ বিশেষ নাম আছে মাত্র। জমিদারের ভিক্ষার নাম মাঙ্গন, তাঁহাদের অনুচরদিগের ভিক্ষার নাম পার্ব্বণী, ভব-পারাবারের ত্রাণকর্ত্তা গুরুবর্গের ভিক্ষার নাম প্রণামী, আত্মীয় সমতুল্য ব্যক্তির ভিক্ষার নাম বিদায়। বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ, সে গ্রামের ভদ্রলোক-দিগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, আর তাহাদের যুবতীদিগের—অবলা বালাদিগের ভিক্ষার নাম—সেজতোলানি। নাছোড়বন্ধ ব্রাহ্মণ ভিখারীর ভিক্ষার নাম বার্ষিক। যাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরদেবতা আছেন, তাঁহার ভিক্ষার নাম দর্শনী। রাজরাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর; কেবল অন্ধ খঞ্জ, দীন দুঃখীর ভিক্ষার নাম ভিক্ষা। না হবেই বা কেন? তাহারা যে পরের ধন চাহিয়া লইবার বাসনা করে, তাহাদের এত বড় যোগ্যতা!

ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে; আমাদের সংস্কার ভিক্ষা। জন্মগ্রহণ করিয়াই ভিক্ষা পাই, তারে বলি যৌতুক। তার পর অন্নপ্রাশন; অন্নপ্রাশনেও যৌতুক। ব্রাহ্মণের তার পর উপনয়ন; উপনয়নে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে না করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বিবাহ, তখন সোনায় সোহাগা, নববধূর চাঁদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। শেষ মৃত্যু; সে ব্যাপারটায় বড় বাঁধাবাঁধি,—যম ছেড়ে দেয় না, সুতরাং পুত্র গলায় কাচা বাঁধিয়া আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাহির হয়।

আমাদের চক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নাই। সেই জন্য আমাদের পূজ্য—দেবতামধ্যে প্রধান মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছি। আর বিষ্ণু বামন-অবতারে ভিক্ষা করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। এখনও কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলে ঠাকুরকে পয়সাটি না দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণবিভাগ বদ্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিল; যথা,—বৈশ্যে বাণিজ্য, ক্ষত্রিয়ে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের বৃত্তিও শ্রেষ্ঠ হইল,—তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অতএব ইহা স্থির যে, এ সংসারে ভিক্ষাই সার পদার্থ।

ভিক্ষায় আর এক সুখ আছে,—আদায়ের সুখ। খাতক যদি আমার কর্জ্জ শোধ না দেয়, তবে মহাকষ্ট; তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। প্রভু যদি বেতন না দেয়, তবে আরও জঞ্জাল; উপায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই সুনীতি যে, ভিক্ষা আদায়ের নানা শাসন আছে। প্রজা যদি জমিদারকে ভিক্ষা না দেয়, জরিমানা কর—মিথ্যা নালিশ কর—চাল কাটিয়া উঠাইয়া দাও। শিষ্য যজমান যদি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দেয়, অভিসম্পাত কর—বেটার সবংশে নির্ব্বংশ দাও; তাহাতেও না দেয়, পইতা ছেঁড়—আর একটা পইতা কিনিয়া পরিও; ইচ্ছা হয় তেরাত্রি কর, পার যদি ত লুকাইয়া লুকাইয়া কিছু কিছু আহার করিও; উনানে পা পুরিও, কিন্তু দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণ না হইয়া জাতি-ভিখারী হও, তবে ধন্না দিও, মারে কাটে দ্বার ছেড়ো না। শ্রাদ্ধের সময় ভিক্ষা করিতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ, তার নরক দেখাইতে ভুলিও না। পশ্চিম দেশে আর একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল,—তাহারা ঝাঁটা মারিয়া ভিক্ষা করে; পার ত দাতাকে প্রথমে সেইরূপ সমাদরসূচক অভ্যর্থনা করিও।

ব্রাহ্মণ-ভিখারী! তোমাকে আরও দুই একটা পরামর্শ দিবার আছে। তুমি ভিক্ষুক—পূজ্য ব্যক্তি, যাহার দান লইবে, তাহার সহিত একাসনে বসিও না—উচ্চাসনে বসিও; সে ব্যক্তি দাতা বই ত নয়, তোমার সমানস্পর্দ্ধী? দাতার যদি সহজে মন না ভিজে, তাহার মাথায় শ্রীচরণখানি তুলিয়া দিও; ইহাতে কোন ক্রমেই সঙ্কোচ করিও না। ভিখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, গোবর ও বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে—তথাপি দাতার মাথায় সোনার কিরীট থাকিলেও তাহার উপর পদ স্থাপন করিতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হয়, ভ্রূভঙ্গী করিও—ফিরিয়া দাঁড়াইও; আগে বলিও, "দেবে না কেন?" তাহাতেও না দেয়, অভিসম্পাত করিও; পুত্রগুলির অমঙ্গলটা আগে দেখাইও। তবু কিছু না দেয়, বাপ চৌদ্দ পুরুষকে গালি দিয়া চলিয়া আসিও। কার্য্যোদ্ধারের আর এক উপায় আছে,—ডিপে-হাতে বৈদ্য, কি পাঁজি-হাতে দৈবজ্ঞ ইত্যাদি লোকের দেখা পাইলে দুই চারিটা উদ্ভট কবিতা শিখিয়া রাখিও; কষ্ট করিয়া অর্থ শিখিবার প্রয়োজন

নাই। প্রথমে আসন গ্রহণ করিয়াই তুই একটা কবিতা ছাড়িও; পরে উপস্থিত কথার সহিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা হোক একটা অর্থ করিয়া দিও। তসর কাপড়খানা আর ফোঁটার আড়ম্বরটা চাই, আর যখন যেমন, তখন তেমনি দাঁও ফাঁদিয়া বসিও। সুদের সুদ ছাড়িও না,—শাস্ত্রসম্মত দানটা হইলে দক্ষিণাটা না এড়ায়। যদি শুনিতে পাও যে, অমুক বাবুদের বাড়ী একটা বড় ক্রিয়া, সেই সময় সময় কালে গোহালের গরুগুলা বাহিরে বাঁধিয়া তথায় টোল ফাঁদিয়া বসিও; মামাত পিসিতত ভাইগুলাকে সাধিয়া পাড়িয়া দিন তুই তথায় পুরিও। পরে পত্রখানা জুটিলে সভায় উপস্থিত হইও। দেখ, গ্রামের বার্ষিক সামাজিক-গুলিন যেন না ফস্কায়; সেটায় বড় মান। ফলাহারে কামাই দিও না; ফলাহার করিতে বসিয়া পাত হইতে গোটাকতক সন্দেশ চুরি করিয়া রাখিও; বিদ্যাটি ছেলেগুলিকে শিখাইও। দেখো, চিঁড়ে দইয়ের ফলাহারে নুন মাখিতে ভুলে যেও না। কণ্ঠায় কণ্ঠায় ফলাহারের সমাপ্তি করিয়া আচমনের পর খড়িকা খাইতে খাইতে বলিও, "এত কপালে ছিল, পাষণ্ড বেটার বাড়ী আহার করিতে হইল।" এমন কথা দুটা একটা না বলিলে পাছে লোকে বলে, তুমি পেটের দায়ে ফলাহার করিতে গিয়াছিলে।—'বঙ্কিম-জীবনী,' ৩য় সং, পৃ. ৩৬৫-৬৮।

# নাটিকা

## DRAMATIS PERSONÆ

রামধন—
রামকৃষ্ণ—
কলাবতী—
দিবা—
নিশা—

## প্রথম অঙ্ক

### Scene I

**প্রতাপনগরের রাজবর্ত্ম**

**রামধন—রামকৃষ্ণ**

রামধন। কিসের এত গোল।

[ নেপথ্যে বহু লোকে **"জয় জয় কলাবতী"**।

ও কিসের জয়ধ্বনি।

রামকৃষ্ণ। জান না, রাণী কলাবতী স্নান করিয়া যাইতেছেন।

রামধন। রাণী স্নান করিয়া যাইতেছেন, তার এত জয়ধ্বনি কেন?

[ নেপথ্যে "জয় জয় রাণীজিকি জয়"।

ঐ শুন।

রামকৃ। তুমি বিদেশী, তাই অবাক্ হইতেছ। রাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক বড় ভক্তি করে। বড়ই ভালবাসে।

রামধ। কেন, রাণীর কিছু বিশেষ গুণ আছে।

রামকৃ। তা আছে—রাণী অতিশয় দানশীলা আর বড় প্রজাবৎসলা। যার যে দুঃখ থাকে, রাণীকে জানাইতে পারিলেই—হইল—তার দুঃখ ঘুচিবে।

[ নেপথ্যে "জয় জয় মা মা কলাবতীর জয়"

ঐ শোন, সকলেই রাণীকে মা বলিতেছে, তিনি প্রজামাত্রেরই মা'র মত। তাঁর গুণেই এখানকার প্রজারা এত সুখী।

রামধন। বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাতি কেন?

রামকৃষ্ণ। রাণীর গুণে।

রামধন। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কি প্রাচীনা।

রামকৃষ্ণ। না, তিনি বড় অল্পবয়স্কা, তবে সকলের মা বলিয়া সকলকেই দেখা দেন। চল না আমরা মাতৃ-দর্শনে যাই?

রামধন। চল।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

## SCENE 11

### রাজার অন্তঃপুর

রাজা রাজেন্দ্র একা

রাজা। কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? তবে কেন এত ভাবি—মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। এ মেঘও উড়িয়া যাইবে—তবে কেন এত চিন্তা করি? মনে করিয়াছিলাম, এ নির্ম্মল আকাশে কখনও বুঝি মেঘ উঠিবে না, আমি মূর্খ, তাই এত ভাবি। হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবল শত্রু দেখা দিল?

কলাবতীর সজ্জিতা সখীদিগের প্রবেশ

তোরা কেন গো? এত সাজগোজ যে।

দিবা। আমরা নাচব।

রাজা। খানখা নাচবে কেন গো ?

নিশা। রাণী কলাবতীর হুকুম।

[ নৃত্য আরম্ভ

রাজা। কেন, নাচের হুকুম কেন ?

দিবা। আগে নাচি।

[ নৃত্য

রাজা। আগে বল্।

নিশা। আগে নাচি।

রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না—জোর করে নেচে যাবি না কি—আমি দেখিব না—এই চোক বুজিলাম।

[ চোখ বুজিয়া ]

দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্চে।

নিশা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে কলা দেখাচ্চে।

রাজা। মরগে যা তোরা! আমি চোক চাব না।

নিশা। আচ্ছা, কান তো খোলা আছে।

করতালি দিয়া গীত

নয়ন মুদিয়া, দেখিনু সজনী,
কানুর কুটিল রূপ।
গলেতে বাঁধিয়া পিরীতি কলসী
সাগরে দিনু যে ডুব।

রাজা। শুনবো না ( কর্ণে হস্তার্পণ )।

দিবা। তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন।

( কবরী হইতে পুষ্প লইয়া রাজার নাসিকার নিকট ধারণ )

রাজা। নিশ্বাস বন্ধ করিলাম।

নিশা। চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ। রসনা বাকি আছে—চল ভাই, রান্নামহলে খবর দিই।

রাজা। মুখ বুজিয়া থাকিব।

নিশা। তবে বড় মা ঠাকুরাণীকে ডেকে দিই।

রাজা। কেন, সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন ?

নিশা। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনার বাকি আছে পিটের চামড়া।

কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। আ মলো, তোরা বড় বাড়ালি, দূর হ !

[ সখীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। দেখ ত কলাবতী, তোমার লোকজন আমায় কিছু মানে না, আমার উপর বড় অত্যাচার করে !

কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ ? একটু হাসিয়েছে ? সেটা আমারই অপরাধ। তোমার মুখে কয় দিন হাসি দেখি নাই বলিয়া আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে—আমি হাসিব কি ?

কলা। কি পাহাড় মহারাজ ! আমায় ত কিছু বল নাই। যা ইচ্ছা করিয়া বল নাই—তা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। কি পাহাড় ! মহারাজ ; পড়িলে তোমার একার ঘাড়ে পড়িবে না ?

রাজা। পাহাড় আর কিছু নয়—খোদ দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গেব। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর নজর পড়িয়াছে, বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে, তাহা তিনি না লইয়া ছাড়েন না।

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন ?

রাজা। আত্মীয় লোকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকায় সুবাদার অনেক সৈন্য জমা করিতেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগরের জন্য।

কলা। কেন, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি ?

রাজা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগরের ধনধান্য পূর্ণ—লোক এখানে দারিদ্র্যশূন্য—আর আমরা হিন্দু ! হিন্দুর ঐশ্বর্য্য বাদশাহের চক্ষুঃশূল।

কলা। যদি এ সম্বাদ সত্য হয়, তবে আমরাও যুদ্ধের উদ্যোগ না করি কেন ?

রাজা। তুমি পাগল ! দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ কি আমার সাধ্য। জয় কি হইবে ?

কলা। না, তবে বিনা যুদ্ধে মরিব কেন ?

রাজা। দেখি যদি বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই। আপনি সুবাদারের মন বুঝি, কোন ছলে যদি বশীভূত করিতে পারি করি।

কলা। এমন কর্ম্ম করিও না—ঔরঙ্গজেবের নাএবকে বিশ্বাস কি ? আর আসিতে দিবে না।

রাজা। সম্ভব—কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইবে কি ?

কলা। রাজহীন রাজ্য সহজে হস্তগত করিবে।

রাজা। আমি গেলে তুমি রাজ্যের রক্ষক থাকিবে।

কলা। ছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে বল কি ?

রাজা। এখানে বাহুবলের কাজ নয়। বুদ্ধিবলই ভরসা। প্রতাপনগরে বুদ্ধিবল তুমি একা।

কলা। মহারাজ, আপনাকে যাইতে দিতে আমার মন সরিতেছে না।

রাজা। থাকিলেই কোন্ মঙ্গল! যুদ্ধেই কোন্ মঙ্গল!

কলা। মারহাট্টা যুদ্ধ করিতেছে—আমরা কি মানুষ নই?

রাজা। না, আমরা মানুষ নই। শিবজীর কাজ কি আমার দ্বারা সম্ভবে? আমি যাওয়াই স্থির করিতেছি। এখন শয়নঘরে চলিলাম।

[ নিষ্ক্রান্ত।

কলাবতী। (স্বগত) বিধাতা, যদি আমায় স্ত্রীলোক করিয়াছিলে, তবে আমায়—দূর হোক, সে কথায় এখন আর কাজ কি? হায়! আমি রাণী, কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপনগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত রাজা পাইলাম না কেন?

দিবার প্রবেশ।

(চক্ষু মুছিয়া) কি লো দিবি?

দিবা। এই কাগজটুকু কুড়িয়ে পেয়েছি।

[ এক পত্র দিল।

কলা। (পড়িলেন) "আমি রাজা রাজেন্দ্রের আজিও প্রবল শত্রু—প্রতাপনগর ধ্বংস করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় এসো।"
এ পত্র কোথায় পাইলি?

দিবা। আজ্ঞে, আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

কলা। তোকে ফাঁসি দিব। আবশ্যক হইলে আমি হুকুম দিই, তা তুই জানিস?

দিবা। জানি—তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম ত কোথা পেলুম?

কলা। কোথা পেলি? তুই হাতে হাতে নিয়েছিস!

দিবা। মাইরি রাণীমা, আমি হাতে হাতে নিই নে।

কলা। তবে কোথায় পেলি বল, নইলে ফাঁসি দিব।

দিবা। আমি পায়রার গলায় পেয়েছি।

কলা। সে পায়রা কোথায়?

দিবা। পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

কলা। কালি কলম নিয়ে আয়—জবাব লেখ্।

দিবা। কালি কলম আছে—কি লিখিব।

কলা। লেখ্ "আমি তোমার পরম শত্রু—তোমায় ধ্বংস করিয়া প্রতাপনগর রক্ষা করিব।" লেখা হইল ?

দিবা। লিখেছি—পায়রার গলায় বেঁধে দিয়ে আসি ?

কলা। দে গিয়ে।

দিবা। হাঁ রাণীমা, এ কে মা—

কলা। চুপ ! কথা মুখে আনিলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব।

[ দিবা নিষ্ক্রান্ত।

কলা। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা দিয়ে বাহির করিতে হয়, বুঝি আমাকে তাহাই করিতে হইবে।

## Scene III

### রাজার অন্তঃপুর

দিবা—নিশা।

দিবা। রাজা ঢাকায় চলিল কেন ভাই ?

নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আন্‌তে।

দিবা। আমি ত এমন হুকুম দিই নে, আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে।

নিশা। তবে তোর বর আন্‌তে।

দিবা। কেন, এ দেশে কি বর পাওয়া যায় না ?

নিশা। এ দেশে তেমন দাড়ি পাওয়া যায় না—তোকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে।

দিবা। তা তার জন্য আর রাজার নিজে যাবার দরকার কি ? আমায় বললে আমি একটা খুঁজে পেতে নিতুম। না হয় গোবিন্দ বখশীকে একটা পরচুলো দাড়ি পরিয়ে ঘরে নিয়ে আসতুম।

নিশা। আচ্ছা, বখশী মশাইকে বলে রাখ্‌ব।

দিবা। দূর হ পাপিষ্ঠি—তোর কাছে কোন কথাই বলবার জো নাই। তা যাক্—সত্য সত্য রাজা ঢাকায় চল্‌ল কেন ?

নিশা। কি জানি, কেন—রাজা রাজড়ার মন তুমি আমি কি বুঝ্‌ব।

দিবা। তা, রাজা কি ফিরিবে না নাকি ?

নিশা। সে কি কথা ? অমন কথা মুখে আনতে আছে !

দিবা। রাণী কলাবতী অত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কেন ?

নিশা। স্বামী বিদেশে গেলে একটু কাঁদ্‌তে হয়।

দিবা। দূর! স্বামী ছেড়ে স্বামীর বাবার জন্য আমি কাঁদি নে।

নিশা। তোর সাত পুরুষের ভিতর স্বামী নাই, তুই আবার কাঁদিবি কার জন্যে? বরং রাজার জন্য একটু কাঁদিস ত কাঁদ।

দিবা। না ভাই, তা পারিব না। বরং মনের দুঃখে বসে বসে লুচি মণ্ডা খাই গে চল।

নিশা। তাও মন্দ নয়।

## দ্বিতীয়াঙ্ক

### Scene I

সুবাদার—রাজা।

রাজা। আমার কি অপরাধ? কি জন্য দিল্লীশ্বর আমার উপর পীড়ন করিতে উদ্যত।

সুবা। আপনি মুসলমানের দ্বেষক। বাদশাহ মুসলমানের ধর্ম্মরক্ষক। সুতরাং বাদশাহ—

রাজা। আমি কিসে মুসলমানের দ্বেষক? আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান তুল্য—

সুবা। প্রতাপনগরে একটি মসজিদ নাই—মুসলমানে নমাজ করিতে পায় না।

রাজা। আমি মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুবা। প্রতাপনগরে একটি কাজি নাই—মুসলমানের বিচার কি হিন্দুর কাছে হয়?

রাজা। আমি কাজি নিযুক্ত করিব।

সুবা। মহারাজ—আপনি যদি বাদশাহের এরূপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে বাদশাহ কেন আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? কিন্তু আসল কথা এখনও বাকি আছে—প্রতাপ-নগরে মুসলমানে জবাই করিতে পায় না—তার কি হইবে?

রাজা। গোরু ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপত্তি করিব না।

সুবা। কিন্তু গোরুই আসল কথা।

রাজা। হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিতে দিব কি প্রকারে?

সুবা। তবে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করুন।

রাজা। ধর্ম্মত্যাগ করিব? ইহকাল পরকাল খোওয়াইব? এ কথাও কানে শুনিতে হইল।

সুবা। ইহকাল নষ্ট হইবে না। আপনি ইসলামের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বরং ইহকালে সুখী হইবেন। রাজ্য বজায় থাকিবে, বরং আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে না। ইসলামই সত্য ধর্ম্ম—দেখুন, কত বড় বড় হিন্দু এখন মুসলমান হইতেছে। তাহারা কি না বুঝিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিতেছে? বরং আপনার যদি সন্দেহ থাকে, তবে

আমি ভাল মোল্লা মুফ্‌তি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি। তাদের সঙ্গে বিচার করুন্‌—বিচারে যদি ইসলাম সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিবেন ত ?

রাজা। ইচ্ছা হয়, মোল্লা মুফ্‌তি পাঠাইবেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি আমি যাহা নিবেদন করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া বাদশাহের নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন আর সকলেই আমি সম্মত—বার্ষিক কর দিতেও সম্মত। আজ আমি বিদায় হইব—যে হুকুম হয়, অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

সুবা। কোথা যাইবেন ?

রাজা। অনেক দিন আসিয়াছি, স্বদেশে যাইব।

সুবা। সে কি ? আপনার শুভাগমনের সম্বাদ আমি দিল্লীতে এত্তেলা করিয়াছি। সেখান হইতে খেলওয়াত আসিবে—তাহা না গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়।

রাজা। বড় অনুগৃহীত হইতেছি, কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে।

সুবা। নাচার—আপনাকে অবশ্য অবশ্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আপনার ফৌজ সকল বিদায় দিন।

রাজা। সে কি ? আমাকে কয়েদ রাখিতে চাহেন।

সুবা। ও সব কথা কেন ? তবে দিন কত আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। দিল্লীর হুকুম না আসিলে ছেড়ে দিতে পারিব না।

রাজা। ( স্বগত ) হায় ! কলাবতি, তুমি যা বলিয়াছিলে, তাহাই হইল ! ( সুবাদারকে ) যাহা হুকুম হয়, তাহাই তালিম করিব।

সুবা। তছলীম।

[ সুবাদার নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ—প্রমথ—

প্রমথের প্রবেশ।

আমার আজকাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও।

প্রমথ। যাইব কি প্রকারে ? সকল পথে পাহারা—আমাদের কয়েদ করিয়াছে।

রাজা। আমার সিপাহী সব কোথা ?

প্রমথ। নবাবের লোকে তাহাদের হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়াছে—তাহাদিগকে প্রতাপনগর ফিরিয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে।

রাজা। ভাল, তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে।

প্রমথ। দিলেই বা কি হইবে।

## SCENE II

কলাবতী—নিশা।

কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন। আজও কই কোন সম্বাদ ত পাইলাম না।

নিশা। হাঁ রাণীমা, রাজরাণীতেও কি এমনি কর্য়ে দিন গণে ?

কলা। কই আমি দিন গণিলাম ?

নিশা। কাঁদ কেন মা, আমি ত এমন কিছু বলি নাই।

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা সিয়ানা লোক পাঠাইতে পারিস্—অবশ্য কেহ কোন সম্বাদ শুনিয়াছে ; কেন না, ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে। আমি এত লোক পাঠাইলাম, কেহ ত ফিরিল না। বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আসিয়াছে—লোকে সাহস করিয়া আমার সাক্ষাতে বলিতে পারিতেছে না।

নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি আপনার বুদ্ধিতেই শহরে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইয়া দিলাম—কিন্তু—

কলা। কিন্তু কি ?

নিশা। লোকে বলে যে, মহারাজকে সুবাদার আটক করেছে—অমন কর কেন মা! এই জন্য ত বলি নাই। একটু শোও, আমি বাতাস করি। উড়ো কথায় বিশ্বাস কি ?

( কলার শয়ন )

কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ। আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে, গেলে তাঁকে আটক করিবে। নিশি! এখন আমার দশা কি হইবে! ( রোদন )

নিশা। কাঁদিলে কি হবে মা। আমাদের সকলেরই ত এক দশা হবে। আমরাও নিরাশ্রয় হইলাম—এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান প্রাণ সব যাবে ?

কলা। কি বলিলি—সবার এক দশা ? তোদের যে রাজা মাত্র—আমার যে স্বামী। তুই কি জানিস স্বামী কি ধন!

নিশা। তা বটে। রাজ্য যায়, তবু প্রাণটা থাকিলে আমরা বজায় থাকিব। ভাল মা, এক কাজ কর না কেন ? রাজার কাছে কেন লোক পাঠাও না যে, সুবাদারকে

রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসুন—আমরা না হয় তাঁকে গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া খাওয়াইব। কাঁদ কেন মা এ কথায় ?

কলা। তুই কেন আমায় অপমান করিস্? কি! আমার স্বামীকে আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলিব। নিশা—তোদের ভয় হইয়া থাকে, তোরা চলিয়া যা—আমার স্বামী রাজা—তিনি রাজার কাজ করিবেন।—কিসের গোল ঐ ?

( নেপথ্যে বহু লোকে "জয় মা কলাবতীর জয়" )

আজিকার দিনে কে বলে কলাবতীর জয় ?

( দিবার প্রবেশ )

দিবা। মহারাণি! নগরের সকল প্রজা আসিয়া রাজবাড়ী ঘেরিল।

কলা। কি হয়েছে!

দিবা। সকলে বলিতেছে, ঢাকার সুবাদার রাজাকে কয়েদ করিয়াছে।

কলা। তার পর প্রজারা কি বলে।

[ নেপথ্যে "মহারাণী কলাবতীর জয়"।

ওরা কি চায় দিবা ?

দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন।

কলা। প্রজারা আমার পুত্র, আমার [ নিকট ] অবারিতদ্বার। প্রধানদিগকে আমার কাছে ডাকিয়া আন।

[ দিবার প্রস্থান। কতিপয় নগরবাসীর সহিত পুনঃপ্রবেশ।

প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়।

কলা। কি চাও বাবা তোমরা ?

১ম প্রজা। মা, আমাদের রাজা কোথায় ?

২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে না কি দুষ্ট যবন কয়েদ করিয়াছে। মা, আমাদের বাহুতে কি বল নাই যে, বাপের উদ্ধার করি ?—'বঙ্কিম-কণিকা,' পৃ. ১-২২।

# সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

# নূতন গ্রন্থের সমালোচনা

আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশে আমাদিগকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদিগের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।—'বঙ্গদর্শন,' কার্ত্তিক ১২৭৯, পৃ. ৩৩৬-৩৭।

## THREE YEARS IN EUROPE.*

আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থখানি সবিস্তারে সমালোচিত করিব। অবকাশাভাবে এ পর্য্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারি নাই। পাঠকেরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এ দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, সন ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ড হইতে সহোদরকে পত্র লিখিতেন। তিন বৎসরে

---

* *Three years in Europe, being Extracts from Letters sent from Europe*, Calcutta. I. C. Bose & Co. 1872

যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ইংরাজি গ্রন্থাদি হইতে ইংলণ্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। তথাপি, অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা হস্তীর আকার অনুভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান। ইংরাজি গ্রন্থ বা পত্রাদি ইংরাজের প্রণীত। ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরূপ চিত্রিত। আমাদিগের চক্ষে ইংলণ্ড কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না। মসূর তাইন একজন কৃতবিদ্য ফরাসী। তিনি ফরাসীর চক্ষে ইংলণ্ড দেখিয়া, তদ্দেশবিবরণ একখানি গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজের চিত্রিত ইংলণ্ড হইতে মসূর তাইনের চিত্রিত ইংলণ্ড অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। ইংরাজ ও ফরাসীতে বিশেষ সাদৃশ্য; আমাদিগের চক্ষে দেখিতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, এক জাতি, এক ধর্ম্মাক্রান্ত; উভয়ের এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, এক প্রকার স্বভাব। যদি ফরাসীর লিখিত চিত্রে ইংলণ্ড এইরূপ নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত তারতম্য ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালীর হস্তলিখিত একখানি ইংলণ্ডের চিত্র দেখিবার আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পুরাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একটু অনুকূল চক্ষে দেখিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকের চক্ষে যে ইউরোপ অতি আশ্চর্য্য দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে দেশের জন কয়েক লোক মাত্র সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাঁচ সহস্র মাইল দূরে আসিয়া প্রত্যহ নূতন২ বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের স্বদেশ যে আমাদের নিকটে বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব যাঁহার স্বভাব দ্বেষবিশিষ্ট নহে, তিনিই ইংলণ্ডকে অনুকূল চক্ষে দেখিবেন, সন্দেহ নাই; তথাপি বিদেশে গেলে বিদেশের সকল বিষয় ভাল লাগে না। ইউরোপে কি২ আমাদিগের ভাল লাগে না, সেইটুকু শুনিবার জন্য আমাদিগের বিশেষ কৌতূহল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না।

সেইটুকু আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদিগের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। এ কথা সত্য কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু

প্রত্যহ শুনিতে২ আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই—তাহা কে ভালবাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আমাদিগের দেশবাৎসল্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্ব্বদা ইচ্ছা করে যে, সভ্যতম জাতি অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে পাই না। যাহা শুনি, তাহা সত্যপ্রিয় সুবিবেচকের কথা নহে। যাহা শুনি, তাহা শুদ্ধ স্বদেশ-পিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যাদম্ভপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা—তাহাতে বিশ্বাস হয় না—বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি এই লেখকের ন্যায় সুশিক্ষিত, সুবিবেচক, বহুদেশদর্শী ব্যক্তির নিকট সে কর্ণানন্দদায়িনী কথা শুনিতে পাইতাম—তবে সুখ হইত। তাহা যে শুনিলাম না, সে লেখকের দোষ নহে—আমাদের কপালের দোষ। লেখক স্বদেশবিদ্বেষী বা ইংরাজ-প্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশবৎসল, স্বদেশবাৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতাগুলিন লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জন্মভূমি সম্বন্ধে আমরা যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিবার অধিকারী নই, আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায়, আমরা এ আক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। লেখক যদি আমাদিগের মনের ভাব বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনিও আমাদিগের সঙ্গে রোদন করিবেন। যদি কেহ সত্যপ্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন।

আমরা গ্রন্থ সমালোচনা ত্যাগ করিয়া একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়াছি, কিন্তু কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নহে। আমরা যে ভাব ব্যক্ত করিলাম, এই গ্রন্থের আলোচনায় সেই ভাবই বাঙ্গালীর মনে উদয় হইতে পারে। যদি সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ইহা হইতে সেই ভাব উদিত হয়, তবে এ গ্রন্থ সার্থক। তাহা না হইলে ইহার মূল্য নাই।

এই গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। কেন না, ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রণীত হয় নাই। সুতরাং রচনাচাতুর্য্য, বা বিষয়ঘটিত

পারিপাট্য ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভ্রাতার সঙ্গে সরল কথোপকথনের স্বরূপ ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব সমালোচক যে সকল দোষ গুণের সন্ধান করেন, ইহাতে তাহার সন্ধান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সন্ধান করিলেও দোষভাগ পাওয়া কঠিন হইবে, গুণ অনেক পাওয়া যাইবে। ভাষা সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল এবং আড়ম্বরশূন্য, এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। লেখক সর্ব্বত্রেই গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল, এবং সুপ্রসন্ন। তাঁহার রুচিও সুন্দর, বুদ্ধি মার্জ্জিত, এবং বিচার-ক্ষমতা অনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি গুণ দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। চিত্রে বা খোদিত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা অনুভূত করিতে পারেন না। বালকে বা চাষায় "সং" দেখিয়া যেরূপ সুখ বোধ করে, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরাও চিত্রাদি দেখিয়া সেইরূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালী নহেন। তিনি চিত্রাদির যে সকল সমালোচনা পত্রমধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ রসানুভাবকতা এবং সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্য্যটন করিলে, ভুবনে অতুল্য চিত্রাদি দর্শনে, এবং তত্তদ্বিষয়ের বিচক্ষণ বিচারকদিগের সহবাসে যে বুদ্ধি মার্জ্জিতা, এবং রসগ্রাহিণী শক্তি স্ফুরিতা হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্রাহিণী শক্তি স্বভাবজাতাও বটে। তিনি ইউরোপে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মাল্টা নগরে "Charity"র গঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিয়াছেন ;—

"It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness and tender pathos that dwells in the placid and unclouded face of the mother as she gazes with a loving and affectionate look on the sweet heaven of her infant's face. I stood there I know not how long, but this I know I could have stood there for hours together, and not have wished to go away." P. 11-12.

পুস্তকের মধ্যে২ যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে সকল গ্রন্থকারের লিপিশক্তির পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিলাম—

"From Iona we went to the small uninhabited island of Staffa containing several wonderful caves, of which Fingal's cave is the most magnificent. This cave with its splendid arch 70 feet high, supporting an intablature of 30 feet additional,—its dark basaltic pillars, its arching roof above, and the sea ever and anon rushing and roaring below, is a most wonderful sight indeed. The sea being calm we went in a boat to the inner end of the cave. The walls consist of countless gigantic columns sometimes square, often pentagonical or hexagonical, and of a dark purple colour which adds to the solemnity of the aspect of the place. The roof itself consists of overhanging pillars ; and every time that the wave comes in with a roaring sound, the roof, the caverns, and the thousand pillars return the sound increased tenfold, and the whole effect is grand." P. 48.

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুসন্ধায়ী—যেখানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তিনি কালিদনীয় খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন; তিনি লিখিয়াছেন;—

"On both sides of us were continuous chains of mountains, and it being very bad weather, dark clouds hanging over our heads served as a gloomy canopy extending from the ridges on our right to those on our left. As far as the eye could reach, before or behind, there was nothing but this gloomy vista, – the dark clouds above, dark waters below, and high mountains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can assure you. I would not have changed that gloomy scene of highland grandeur for the neatest and prettiest spot in the earth, nor ever for the sunniest sky, the dark rolling clouds which added to the gloom and sublimity of the scene." P. 50.

লেখক মধ্যে২ কবিতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালী হইয়া যিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখন তাঁহার প্রশংসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। সুতরাং তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করুন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা যাদৃশ মনোরঞ্জক এবং উপকারী, ইংরাজি অভিজ্ঞদিগের নিকট তাদৃশ নহে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছু২ জানেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছুই জানেন না। বিলাত কি—মরুভূমি কি জলাশয়, ভূত প্রেত কি রাক্ষসের বাস, তাহার কিছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি যে, বঙ্গসুন্দরীদিগের পাঠার্থে ইহা বাঙ্গালায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা কষ্টকর হইবে না; কষ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালীদিগের মেয়ের এমন শক্তি হইয়াছে যে, এরূপ গ্রন্থ পড়িয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, তাঁহাদের শয়নগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায়। সুতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না, সাহেব কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধরিবে?—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫০৩-০৭।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন

হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্র।

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা একটি আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, "আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীমধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না। অপ্রশংসা দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন; দুই এক জন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল—যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময় আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখন২ দেখিয়াছি যে, মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ত্রুটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন। কখন২ দেখিয়াছি, রাগান্ধ লেখকেরা সমালোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্ব্বিতচর্ব্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া "নূতন" বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নূতন বলিয়াছি। যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চারি হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে,

তাঁহার কথাগুলিন অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন২ দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে২ স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতগুলিন ভাল মানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদিগের বড় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে, প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখকসমাজকে জানাই যে, আমরা বিশ্বনিন্দুক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, এবং বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। অদ্য দুইখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজি আমাদিগের এত আহ্লাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থখানি প্রথমেই সমালোচনীয়।

হিন্দু ধর্ম্ম যে, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্র মাসে জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত মতে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্য্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। সেই প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না; কেন না, তাহা করিতে গেলে হিন্দু ধর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল।

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি এক জন হিন্দুবংশজাত লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা এক জন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে বোধ করি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা বলিতেছি, এ কথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু এ কথা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, বা অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, তদ্বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা, বোধ হয়, বলা যাইতে পারে।

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দু ধর্ম্ম বলেন, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্ম্মের

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।

রাজনারায়ণ বাবু নিজ প্রশংসিত ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দু শাস্ত্রে আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দু ধর্ম্মের একাংশ মাত্র—অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু যেমন হিন্দু ধর্ম্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্ম্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয়মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা যায় না। উপধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা কোন কালে একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, সন্দেহ। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয়, রাজনারায়ণ বাবু এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সকলেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবর্ত্তে হিন্দু কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক্ হইয়া একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার; যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহু লোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের পরিশোধন ভাল। কেন না, তাহাতে বহু লোকের ইষ্ট সাধন হয়। আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এ কথা বলিলাম না; হিন্দু জাতির আনুকূল্যেই এ কথা বলিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতিসুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য্য

সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই, তাহাতে আমাদের সুখ।

"আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

**Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible looks ; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day heaven.**

আমিও সেইরূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারতসন্তান
এক তান মনঃ প্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রতনের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারতললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥"

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে২ মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!

**কিঞ্চিৎ জলযোগ।** প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র।

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে, হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জ্জিত, **একেই কি বলে সভ্যতা** এবং **সধবার একাদশী।** সধবার একাদশী অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। **"কিঞ্চিৎ জলযোগ"** ঐ দুই

প্রহসনের তুল্য নহে বটে, কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে, তথাপি নিন্দনীয় নহে; কেন না, ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

কার্য্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য্য হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য্য সফল হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্ত্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলি। যদি অসদভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুষ্ক্রিয়া। যদি অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

দেখা যাইতেছে যে—পুণ্য, পাপ, বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভর্ৎসনা, দণ্ড বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

নিষ্ফল ক্রিয়া প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য পৃথক্২ নাম আছে। একটিকে Error বলে, আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ার অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম্ম বলি, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Follyও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐরূপ অসঙ্গত কার্য্য বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু

এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেন না, অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।

পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন২ স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্য্যভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে, তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।—'বঙ্গদর্শন,' চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৫৭১-৭৬।

# বিরহিণীর দশ দশা

১

প্রথম দশা দিনে, বেরি বেরি রোওল,
শেজে পাড়ি কাঁদে ভূমি লুটি।
দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখি মেলি হেরল,
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গিল উঠি॥

২

তৃতীয় দশা দিনে, মৃহু মৃহু হাসিল,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ।
চউঠ দশা দিনে, সিনান করি আওল,
হাঁড়ি পাড়ি খাওল পান্তা ভাত॥

৩

পঞ্চম দশা দিনে, বান্ধি চারু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের।
ষষ্ঠম দশা দিনে, পিঠা পুলি বানাওল,
কাঁদিতে২ তার গিলিল তিন সের॥

৪

সপ্তম দশা দিনে, সজিনা খাড়া রাঁধিল,
বলে প্রাণ বঁধু কোথা গেলে।

যে খাড়া রেঁধেছি ভাই, তুমি বঁধু কাছে নাই,
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে ॥

৫

অষ্টম দশা দিনে, বিরহ বিষাদিনী
মন দুঃখে কিনিল ইলিশ।
তিতিয়া নয়ন জলে, ভাজায় ঝোলে অম্বলে,
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ ॥

৬

নবম দশা দিনে, পেট ফেঁপে ঢাক হলো,
আইল কানাই কবিরাজ।
সই বলে কর্ম্মভোগ, এ ঘোর বিরহ রোগ,
কবিরাজে নাহি ইথে কাজ ॥

৭

দশম দশা দিনে, বিরহিণী মরে নরে,
আই ঢাই বিছানায় পড়ি।
কাতরে কহিছে সতী, কোথা পাব প্রাণপতি,
কোথা পাব পাচকের বড়ি ॥

৮

বিরহীর দশ দশা, পন্ পন্ করে মশা,
মাছি উড়ে ছেলে কাঁদে কোলে।
চাকরাণীর চীৎকার, সইসাঙ্গতির টিট্‌কার,
খেদে কবি ছন্দোবন্ধ ভোলে ॥

—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫২১।

# দুর্গা

শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইঁহাদিগের পূজা না করে, এমত হিন্দু প্রায় বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্ব্বকর্ম্মব্যাপী হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরাও "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া গাত্রোত্থান করে। যে কিছু লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হইলে, আগে দুর্গানাম লিখিতে হয়। "দুর্গে" "দুর্গে দুর্গতিনাশিনি" ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রতি নিঃশ্বাসেই নির্গত হয়। আমাদের প্রধান পর্ব্বাহ দুর্গোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্ম্ম বা প্রধান আনন্দ। সম্বৎসর তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে২ কালীর মঠ। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কালীপূজা। কোন গ্রামে পীড়া আরম্ভ হইলে রক্ষাকালীপূজা। কাহারও কিছু অশুভ সম্ভাবনা হইলেই চণ্ডীপাঠ—অর্থাৎ কালীর মহিমা কীর্ত্তন। ইঁহার প্রীত্যর্থ পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিও মদ্যপান ও অন্যান্য কুৎসিত কর্ম্মে রত। ফলে এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। ডাকাইতেরা ইঁহার পূজা না দিয়া ডাকাইতি করে না।

এই দেবী কোথা হইতে আসিলেন? ইনি কে? আমাদিগের হিন্দু ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিবার কারণ এই যে, এই ধর্ম্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত কি না সন্দেহ। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বেদে না থাকে, তবে হয় বেদ অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত নহে। বেদ অসম্পূর্ণ, ইহা আমরা বলিতে পারি না; কেন না, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। তবে দ্বিতীয় পক্ষই এমন স্থলে অবলম্বনীয় কি না, তাহা হিন্দুদিগের বিচার্য্য।

দুর্গার কথা বেদে আছে কি? সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে, এ কথার অনুসন্ধান করেন। আমরা অদ্য তাঁহাদের এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিব।

অনেকেই জানেন যে, বেদ একখানি গ্রন্থ নয়। অথবা চারি বেদ চারিখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। কতকগুলিন মন্ত্র, কতকগুলিন "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ, এবং কতকগুলিন উপনিষদ্ লইয়া এক একটি বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্ত্রই বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে।

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু, সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার ভূরি২ উল্লেখ ও স্তুতিবাদ আছে; পূষণ্, অর্য্যমন্ প্রভৃতি এক্ষণে অপরিচিত অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু দুর্গা বা কালী বা তাঁহার অন্য কোন নামের বিশেষ উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে "রাত্রি পরিশিষ্টে" একটি দুর্গা-স্তব আছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে যদিও দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আমাদের পূজিতা দুর্গা বলা যাইতে পারে না। উহা রাত্রি-স্তোত্র মাত্র। সন্দিহান পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম।

আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ত্ততে তমঃ ॥ ১ ॥
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্বষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততীঃ ॥ ২ ॥
রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং ॥ ৩ ॥
সম্বেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্।
প্রপন্নোঽহং শিবাং রাত্রিং
ভদ্রে পারং অশীমহি ভদ্রে পারং অশীমহি ওঁ নমঃ ॥ ৪ ॥
স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াং।
সহস্রসংমিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ॥ ৫ ॥
শান্ত্যর্থং তদ্দ্বিজাতীনামৃষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ। (সমুপাশ্রিতাঃ?)
ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ॥ ৬ ॥
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহিনাং।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতিদুর্গানি বিশ্বাঃ ॥ ৭ ॥
অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্ তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৮ ॥
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্টগ্রহনিবারণে ॥ ৯ ॥
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু তেষাং মে অভয়ং কুরু ওঁ নমঃ ॥ ১০ ॥
কেশিনীং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
সা মাং সমা নিশা দেবী সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু ওঁ নমঃ ॥ ১১ ॥
তামগ্নিবর্ণাস্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ১২ ॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু সন্নোদেবীরভীষ্টয়ে।
য ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদা পঠেৎ।
রাত্রিঃ কুশিকঃ সৌভরো রাত্রিস্তবো গায়ত্রী রাত্রিসূক্তং জপেন্নিত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

এই সংস্কৃত এক২ স্থানে অত্যন্ত দুরূহ, এজন্য আমরা ইহার অনুবাদে সাহসী হইলাম না। ডাক্তার জন মিয়োর কৃত ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ নিম্নে লিখিলাম। তাঁহার অনুবাদও সন্তোষজনক নহে।

"হে রাত্রি! পার্থিব রজঃ তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে বৃহতি! তুমি দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ বর্ত্তে। যে নরদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত, তাহারা নবনবতি বা অষ্টাশীতি বা সপ্তসপ্ততি হউক (অর্থ কি?) সর্ব্বভূতনিবেশনী, জননী, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, এবং বিশ্বজগতের নিশাস্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। সকলের প্রবেশকারিণী, শাসনকর্ত্রী (?), গ্রহনক্ষত্রমালিনী, মঙ্গলযুক্তা রাত্রিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; হে ভদ্রে! আমরা যেন পারে যাই, আমরা যেন পারে যাই, ওঁ নমঃ। দেবী, শরণ্যা, বহ্বৃচপ্রিয়া, সহস্রতুল্যা দুর্গাকে আমি যত্নে তুষ্ট করি। আমরা জাতবেদাকে (অগ্নি) সোম দান করি। দ্বিজাতিগণের শান্ত্যর্থ তুমি ঋষিগিগের আশ্রয় (?), ঋগ্বেদে তুমি সমুৎপন্না, অগ্নি অরাতিদিগের দহন করেন (?) দেবি! যে ব্রাহ্মণেরা, অবিদ্যা হউন বা বহুবিদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, তিনি (?) আমাদের সকল বিপদে ত্রাণ করিবেন। যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবর্ণা, শুভা, সৌম্যাকে কীর্ত্তিত করিবে, সমুদ্রে নৌকার ন্যায় অগ্নি তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে পার করিবেন। বিপদে, ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে, বিষম বিপদে, সংগ্রামে, বনে, অগ্নিনিপাতে, চোরনিপাতে, দুষ্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ওঁ নমঃ। যিনি সর্ব্বভূতের কেশিনী, পঞ্চমী নাম যাঁর, সেই দেবী প্রতি রাত্রে সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন! সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন! ওঁ নমঃ। অগ্নিবর্ণা, তপের দ্বারা জ্বালা-বিশিষ্টা, বৈরোচনী, কর্ম্মফলে জুষ্টা, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে নমস্কার। দুর্গাদেবী বিপদ্স্থলে আমাদের মঙ্গলার্থ হউন। এই পবিত্র দুর্গাস্তব যে রাত্রে২ সদা পাঠ করিবে—রাত্রি, কুশিক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়ত্রী, যে রাত্রিসূক্ত নিত্য জপ করে, সে তৎকাল প্রাপ্ত হয়।"

ইহার সকল স্থলে অনুবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে, তাহার সকল স্থলের কেহ অর্থ করিতে পারে না। কিন্তু এত দূর বুঝা যাইতেছে যে, যদি এই দেবী আমাদের পূজিতা দুর্গা হয়েন, তবে রাত্রির অন্যতর নাম মাত্র।

ইহা ভিন্ন যজুর্ব্বেদের (বাজসনেয়) সংহিতায় এক স্থানে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অম্বিকা শিবিরে ভগিনী। যথা—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ স্বস্রা অম্বিকয়া স্বং জুষস্ব স্বাহা॥"

আর কোন সংহিতায় কোথাও দুর্গার কোন নামের উল্লেখ নাই।

তৎপরে ব্রাহ্মণ। কোন ব্রাহ্মণে কোন নামে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তার পর উপনিষদ্। উপনিষদে দুর্গার নাম কোথাও নাই; এক স্থানে উমা হৈমবতী, আর এক স্থানে কালী করালী নামে উল্লেখ আছে। ঐ দুইটি স্থানই আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম কেনোপনিষদে আছে—

"অথ ইন্দ্রম্ অব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবত্তস্মাত্তিরোদধে।
স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।
তং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি।
সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

"তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, 'মঘবন্, এ যক্ষ কি জানুন।' ইন্দ্র 'তাই' বলিয়া তাহার কাছে গেলেন, সে অন্তর্দ্ধান হইল।

সেই আকাশে বহু শোভমানা উমা হৈমবতী নামক স্ত্রীলোকের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'কি এ যক্ষ?' তিনি কহিলেন, 'এ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের এই বিজয়ে আপনারা মহৎ হউন।' তাহাতে জানিলেন যে, ইনি ব্রহ্ম।"

ইহার অর্থ কি, আমরা বুঝিতে পারিব না, কিন্তু সায়নাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সায়নাচার্য্য এই উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকান্তর্গত এক স্থানে সোম শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, "হিমবৎপুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাৎ গৌরীবাচকো উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যাং উপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি (ইহারই নামান্তর কেনোপনিষদ্) ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিপ্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃ পঠ্যতে। বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ ইতি। তদ্বিষয়তয়া তয়া উময়া সহিতবর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।"

তবে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা মাত্র। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে অর্জ্জুনকৃত একটি দুর্গাস্তব আছে, তাহাতে দুর্গাকে "ব্রহ্মবিদ্যা" বলা হইয়াছে। যথা—

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং।

দ্বিতীয়, মুণ্ডকোপনিষদে এক স্থানে কালী ও করালী নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে কোন দেবীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—অগ্নির সপ্ত জিহ্বার নামের মধ্যে কালী ও করালী দুইটি নাম, ইহাই কথিত আছে, যথা—

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা॥

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, এবং বিশ্বরূপী, এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা।

ইহা ভিন্ন বেদে আর কোথাও দুর্গা, কালী, উমা, অম্বিকা প্রভৃতি কোন নামে এই দেবীর কোন উল্লেখ নাই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রী আছে। তাহা এই—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গী প্রচোদয়াৎ।"

পাঠক দেখিবেন, স্ত্রীলিঙ্গান্ত দুর্গা শব্দের পরিবর্ত্তে পুংলিঙ্গান্ত দুর্গী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার জন্য সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "লিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।" তিনি কাত্যায়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, "কৃতিং বস্তে ইতি কত্যো রুদ্রঃ। স এবায়নং যস্য সা কাত্যায়নী। অথবা কতস্য ঋষিবিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।" কন্যাকুমারীর এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, "কুৎসিতং অনিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী, কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী।"

এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদান্তর্গত রাত্রিপরিশিষ্ট হইতে যে দুর্গাস্তব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ১২ সংখ্যক শ্লোক ঐ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অনুবাকে অগ্নিস্তবে আছে। তাহাতে দুর্গার উল্লেখ আছে, দেখা গিয়াছে।

কৈবল্যোপনিষদে "উমাসহায়ম্" বলিয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঐ স্থলে আশ্বলায়ন বক্তা।

ওয়েবর বলেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অষ্টাদশ অনুবাকে "উমাপতয়ে" শব্দ আছে—কিন্তু ঐ বচন আমরা দেখি নাই।

উপনিষদে বা আরণ্যকে আর কোথাও দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদিগের পূজিতা দুর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মবিদ্যা, না অগ্নিজিহ্বা?"*—'বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৪৯-৫৩।

# জন ষ্টুয়ার্ট মিল

মিলের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই; তিনিও কখন বঙ্গদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে, যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।

---

* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু বেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ডাক্তার জন মিয়োরের সংগ্রহ (Sanskrt Texts) হইতে নীত। সেই সংগ্রহই এই প্রবন্ধের অবলম্বন।

২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে, মিল সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত। পরদিন প্রাতে মিলের কুশল জানিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহচিত্তে সম্বাদপত্র খুলিলাম ; দেখিলাম যে, চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবস অপরাহ্নে সম্বাদ আইসে যে—মিল নাই !

ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি ; না জানি, ইংলণ্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন ! কিন্তু কেনই দুঃখ করি, তাহা বলা যায় না ! যে মহোদয় আপন বুদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন এই ঋণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি এতাদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক, যত্নসহকারে আবেদন করিলেই তাঁহার বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে, এরূপ মহাপুরুষ এত কাল পরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই ? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, "মিল নাই" এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।

মিল অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র এবং অর্থব্যবহারশাস্ত্র তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতে তিনি যে কোন নূতন কথার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সমুদায় কথা এমন সুশৃঙ্খল করিয়া লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয় এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে কাহারই উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না।

তিনি রাজ্যশাসনপ্রণালী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, কিছু কাল পরে ইংলণ্ডে তাহা ফল ধারণ করিবে। তাঁহার পরামর্শ ইংলণ্ডীয়দিগের প্রকৃতির উপযোগী বটে, তথাপি অপর সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এখন সর্ব্বত্র সকলেই সেই পথানুসারী হইতেছে। মিল বলিয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ নিবারণের উপায় রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র, সকলেই বিদ্যাভাস করিবে ; সর্ব্বত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। কাজে না হউক, মনে২ প্রধান২ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই এই সকল কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছচারিতা দমন করিয়াছেন। এখন Absolutist বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার একপ্রকার নিন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার করণ পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছে।

মিল শেষাবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে দুটি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মতে স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ দূরীকৃত হয়, মিল তাহার জন্য অতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। পরিণামে ইহার কি হয় বলা যায় না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে, যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে হয়, যেন মিল আপন স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার গাঢ় পত্নীভক্তি কার্য্যে পর্য্যবসিত করণার্থ ব্রতস্বরূপ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এ স্থলে এ কথা বলিলে তাঁহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসিদেশে আভিনে নামক নগরের এক গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হয়েন এবং ঐ সমাধি সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন বলিয়া মিল তাহার নিকটবর্ত্তী একটি বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটীতে এরিসি-পেলাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয়, মিলের কল্পনা এই যে, পৃথিবীর ভূমিসম্পত্তির উপস্বত্ব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে; ইহার কিয়দংশ কেবল মাত্র সভ্যতার উন্নতিজনিত; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় না, কিন্তু কেবল কতিপয় ভূম্যধিকারীই তাহার ফলভোগী হয়েন। যদ্যপি উপস্বত্বের এই বর্দ্ধিত অংশ রাজহস্তে সমর্পিত হয়, তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজ্যস্থ তাবৎ লোকেই ইহার কিছু২ অংশ পাইতে পারেন। অতএব [illegible] সদুপায় করা কর্ত্তব্য। মিল এই কার্য্যে অতি অল্প দিন হইল, হস্তক্ষেপণ করিয়া তাঁ[illegible]াহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে প্রবর্ত্ত হইবেন, বোধ করি তাহার সম্ভাবনা অল্প।

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্‌তের সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। আমরা মনে করি যে, পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে,—

ব্যক্তিবিশেষ ও জনসমাজ, এতদুভয় মধ্যে মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইবেক, নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক।

আর কোম্‌ৎ বলেন যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও মনুষ্যের স্বার্থানুরাগ পরহিতৈষিতা অপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইবেক না; ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্নের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত, তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

মিল ও কোম্‌তের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের ঐকমত্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টি নিকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে আমরা কোন

কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে, মিল, কোম্‌ৎ দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বলিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এই মাত্র হয় যে, যেমন কিছু দিন পূর্ব্বে খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতেন, মিলকৃত কোম্‌ৎভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।

মিলের ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, তিনি নিজে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য্য হইতে পারে না।

আমরা এত ক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানবজাতির সহিত ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল, তখন মিল প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র-পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। কোর্ট অফ ডাইরেক্‌টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে, ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্য্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত মিলের Liberty নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়া কৌন্সলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক বলিয়া তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে মহারাণীকে এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় রাজ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, এমন লোক কে আছে?

জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার প্রথা অনুসারে মিলের বিষয়ে নিম্নলিখিত তারিখগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল।

| | |
|---|---|
| মিলের জন্ম, ... | ১৮০৬ |
| তৎকৃত System of Logic নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ ... | ১৮৪৩ |
| Essay on Unsettled Questions of Politcal Economy প্রকাশ | ১৮৪৪ |
| মিল ইষ্টইণ্ডিয়া হৌসের Examiner of Indian Correspondence পদে নিযুক্ত ... | ১৮৫৬ |
| মিল উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন ... | ১৮৫৮ |
| মিলকৃত Essay on Liberty প্রকাশ ... | ১৮৫৯ |
| Dissertations and Discussions Political &c., প্রকাশ ... | ১৮৫৯ |
| Thoughts on Parliamentary Reforms প্রকাশ ... | ১৮৫৯ |
| Principles of Political Economy ( অর্থব্যবহারশাস্ত্র ) প্রকাশ .. | ১৮৬১ |
| Considerations on Representative Government প্রকাশ ... | ১৮৬১ |
| Utilitarianism প্রকাশ ... | ১৮৬২ |
| Auguste Comte & Positivism প্রকাশ ... | ১৮৬৫ |
| Examination of Sir W, Hamilton's Philosophy প্রকাশ ... | ১৮৬৫ |
| মিল পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হয়েন ... | ১৮৬৫ |
| তৎকৃত Inaugural Address delivered to the University of St. Andrew প্রকাশ ... | ১৮৬৭ |
| England and Ireland প্রকাশ ... | ১৮৬৮ |
| Subjection of Women প্রকাশ ... | ১৮৬৮ |
| মিলের মৃত্যু ... | ১৮৭৩ |

—'বঙ্গদর্শন,' শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৪৫-৪৮।

# মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে। কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে এক জন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচল-পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমানশক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই। কুল্লূক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?

ভিন্ন২ দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

বঙ্গদেশ, বঙ্গ-কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ-কবিগণ মিলিয়া, বঙ্গীয় কবিকুল-ভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার?

—'বঙ্গদর্শন,' ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০।

# জাতিবৈর

ভারতবর্ষীয় যে-কোন ইংরেজি সম্বাদপত্র (ইংরেজি সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা সম্পাদিত সম্বাদপত্র) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছু গালি—কিছু অন্যায় নিন্দা আছে। আবার যে-কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়ি না কেন, সন্ধান করিলে তাহার কোন অংশে না কোন অংশে—ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ—ইংরেজের নিন্দা অবশ্য দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরেজী পত্র মাত্রেই দেশী লোকের অন্যায় নিন্দা থাকে। বহু কাল হইতে এরূপ হইতেছে—নূতন কথা নহে।

সম্বাদপত্রে যেরূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত। তাঁহারা এই জাতিবৈরকে মহা অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যে সকল সম্বাদপত্রে এই জাতিবৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিবারণার্থ নানাবিধ কূটার্থ, অলঙ্কারবিশিষ্ট প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ অনেক দ্বিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সতরঞ্চের ছকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সমতা জন্য কত ইউনিয়ন ক্লব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যবিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে, এই জাতিবৈর শমিত করিয়া, আমরা উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না?

ইংরেজেরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ, তাহা আত্মগৌরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ। কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, কোন এক জন বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাদিগের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা। যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত, বশ্য এবং ভক্তিমান্ না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ এবং অনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজেরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে, বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান্ হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী, নিস্পৃহ মনে করে; এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না, আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যত দিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।

এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতিবৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যত দূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না—কেন না, সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।

যদি শুভানুধ্যায়ীদিগের যত্ন সফল হইয়া, সম্প্রতি জাতিবৈরিতার উপশম ঘটে, তাহা হইলে আমরা যে মানসিক সম্বন্ধের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা অবশ্য ঘটিবে : জাতিবৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইবে,—কেন না, সে অবস্থা না ঘটিলে জাতিবৈর যাইবে না। এইরূপ মানসিক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। যে বিনীত, সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশূন্য,—যে পরের আজ্ঞানুকারী, সে আত্মানুবর্ত্তিতাশূন্য,—এবং যে প্রভুর প্রতি ভক্তিমান্, সে প্রভুর প্রতি সকল ভার অর্পণ করিয়া আত্মকার্য্যে বিমুখ হয়। যখন বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রতি জাতিবৈরশূন্য হইবে, তখন বাঙ্গালী আত্মোন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তি দিবে না, আত্মরক্ষায় যত্ন করিবে না। তখন ভাবী উন্নতির মূল এককালীন উৎপাটিত হইবে। সে দুরবস্থা কখন না ঘটুক! জাতিবৈর এখনও বহু কাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।

অতএব জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। কিন্তু জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে। দ্বেষ, মনের অতি কুৎসিত অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায়, তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙ্গালী ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন; ইংরেজ বাঙ্গালীর প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু বাঙ্গালীর অনিষ্ট কামনা না করেন। জাতিবৈরের ফলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন বিদ্বেষ ও অনিষ্ট কামনা না ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘটিতেছে।—'সাধারণী,' ১১ কার্ত্তিক ১২৮০।

## সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল

[ এই রচনাটির প্রথমাংশ—"পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর,...স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না"- 'বিবিধ প্রবন্ধ,' ২য় ভাগে "বাঙ্গালা শাসনের কল" প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।—সম্পাদক ]

সর্ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে মুরুব্বি বলিয়া মানিতেন। সুখ্যাতির আশায় এবং গালির ভয়ে তিনি সম্বাদপত্রের আজ্ঞাকারী ছিলেন; ব্রি, ই, আসোসিয়েশনের প্রধান মেম্বরদিগের কেনা বেচার মধ্যে ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুঁজিতেন না; কাহারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বাদপত্র সকলকে ঘৃণা করিতেন, ব্রিটিশ ইঃ আসোসিয়েশনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে লোকের প্রিয়, আর একজন অপ্রিয় হইবেন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশে প্রিয়বাদী ছিলেন, সর্ জর্জ কাম্বেল বড় অপ্রিয়বাদী ছিলেন। সকলকে কটু বলায় সর্ জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই এই অপ্রিয়বাদিত্বের একটি প্রধান কারণ। তিনি জানিতেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ, একা সর্ জর্জ কাম্বেল; আর সকল মনুষ্যই মূর্খ, নির্ব্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার। এইরূপ তমোভিভূত হইয়া সর্ জর্জ কাম্বেল কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। অথচ সকল বিষয়েই আত্মবুদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন।

সর্ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা অকর্ম্মণ্য—কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা, তাঁহার শাসনকার্য্যের আর একটি ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহার প্রতি ঘৃণা আছে, তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যিনি যাহা ধরিতেন, তিনি তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেন না। দুই জনের "রোখ" বড় ভয়ানক ছিল—দণ্ড প্রণয়নের সাধ দুই জনেরই বড় গুরুতর ছিল। দুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় দোষ ছিল যে, বিনাপরাধেও দণ্ডবিধান করিতেন। বিশেষ সর্ জর্জ কাম্বেলের ন্যায়নিষ্ঠতা কিছুই ছিল না।

স্থূল কথা এই যে, সর্ জর্জ কাম্বেল অত্যন্ত গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, কৃষ্ণচর্ম্মে ঘৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্রিয়বাদী, অপ্রিয়কারী, অন্যায়পর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সর্ উইলিয়ম গ্রের এত দোষ ছিল না; তিনি কেবল স্থূলবুদ্ধি ছিলেন; কোনরূপে লোকের মন রাখিয়া, কলে শাসন করিয়া, নিন্দার হাত হইতে মুক্তি লাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

গুণ পক্ষে, সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, এবং অধ্যবসায়সম্পন্ন। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তিনি ক্ষিপ্রকারী এবং দূরদর্শী। তিনি সাম্যবাদী। প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী। সর্ উইলিয়ম গ্রের গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, তিনি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেলের মত বহু গুণে গুণবান্ ও বহু দোষে দোষী শাসনকর্ত্তা কেহই এদেশে আসেন নাই; সর্ উইলিয়ম গ্রের মত দোষশূন্য ও গুণশূন্য কেহ আসেন নাই। গুণবান্ ও দোষযুক্তের শত্রু অনেক, নির্দ্দোষ

ও নির্গুণের শত্রু থাকে না। সর্ জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্ উইলিয়ম গ্রের সুখ্যাতির কারণ এই।

কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে নিন্দা ও সুখ্যাতির সকল কারণ বজায় থাকে না। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছি।

রোড সেসের আইন প্রচার করার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল বিশেষ নিন্দিত, কিন্তু এ বিষয়ে সর্ জর্জ কাম্বেলের দোষ কি? তিনি কেবল উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রোড সেসের দায়ী ডিউক্ অব আর্গাইল; অধস্তন কর্ম্মচারীর সাধ্য নাই, উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর্ জর্জ কাম্বেল রোড সেস বিধিবদ্ধ করিয়া অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা পালন করিয়াছেন মাত্র।

নূতন কার্য্যবিধি আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। প্রথম, জুরির বিচারের অলঙ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ; দ্বিতীয়, সরাসরি বিচারের প্রথা।

সরাসরি বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন করি না। অনুমোদন করি না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া আইন অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেরূপ লিখিত বিচারপ্রণালী প্রচলিত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বিচারকেরা যে কয়েকটির বিচার করিতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অবশিষ্টের দিন ফিরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দিন, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যায়। অর্থী প্রত্যর্থী অনেক বার কষ্ট পাইয়া, রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ সময় পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষিগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের অনবকাশে অনেক মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটি মাত্র উপায় সম্ভবে; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, বিচারকের অবকাশ বৃদ্ধি। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ; বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজার যেরূপ অসন্তোষ, তাহাতে আর টেক্স বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বৃদ্ধির একমাত্র উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা করিলেই অবসর বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্য, সরাসরি বিচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই—কেবল কতকগুলি মোকদ্দমায় লেখাপড়ার অল্পতা করা এক মাত্র উপায়। যদি বল, আপিল উঠিয়া

গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

জুরির বিষয়েও একটি বিশেষ কথা আছে। যদি হাঁড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে বিচারকার্য্যেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নির্ব্বোধ বা কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে। বিচারকার্য্য শিক্ষিত জজের দ্বারা হওয়াই কর্ত্তব্য—যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত বলিতেছি। যদি কাঁসারীকে ঘটি গড়িতে না দিয়া, তাঁতীকে কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাঁচ জন মাটিকাটা মজুরকে দিয়া ঘটি গড়ান বা বস্ত্র বুনান ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্য্য শিল্পকর্ম্মাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি কেবল শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্য্য ভাল? অনেকে বলেন, এক জন বিচারকের উপর নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব এক জন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জুরির বিচার ভাল। ইহা বলিলে বলিতে হয় যে, এক জন নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, এক জন হক্স্‌লী অপেক্ষা পাঁচটি নেটিব ডাক্তার শারীর তত্ত্বে ভাল, এক জন কালিদাস অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের পাঁচ জন পত্র-প্রেরক কবিত্বে ভাল। আমাদিগের সংস্কার আছে যে, যাহা বিলাতী, তাহাই ভাল, বিলাতে জুরির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই জুরির বিচার চালাইতে হইবে! এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকে জানেন না যে, ইংলণ্ডে যখন বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড করিতেন, তখন দীনের রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর দ্বারা ধনীর বিচার, সমানের দ্বারা সমানের বিচার, এই প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে দেশাচার শীঘ্র লোপ পায় না বলিয়াই উহা অদ্যাপি চলিতেছে। এবং কতকগুলি অনুকরণভক্ত দেশেও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জুরির বিচারের প্রথার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জুরির বিচার প্রথার অযোগ্য। জুরির সৃষ্টি হইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে—দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে—হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার নিবারণের জন্যই সর্ জর্জ কাম্বেল জুরির আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে জুরির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, ইহাতেই আমরা দুঃখিত।

কার্য্যবিধি আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদিগের বলিতে বাকি আছে। ব্রিটিশ-ভারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক—দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন আদালত—সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত। এই

লজ্জাকর কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্য্যন্ত অনেকে অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন —কেহ শক্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্য্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। অন্য কেহ করিলে, এত দিন তাঁহার সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়া যাইত। সর্ জর্জ কাম্বেল এ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই।

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার। শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষকপুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়বিগর্হিত কথা। বরং নির্ধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত ; কেন না, ধনিগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্ধনগণ সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগতি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর শিক্ষার্থ যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে ; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। যখন ইণ্ডিয়ান৺লত, তাঁহাদিতে এ প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, দরিদ্র শিকয়েকদ্যির বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর্ উইলিয়ম গ্রে "উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা!" করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল করেন নাই। যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিদ্রশিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।

আরও কয়েকটি বিষয়ে সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, সর্ জর্জ কাম্বেলের কৃত এমন কি কার্য্য আছে যে, তজ্জন্য সর্ জর্জের কিছু প্রশংসা করিতে পারি? আমরা তাহা হইলে বলিব যে, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি উপকার করিয়াছেন, ব্রিটিশজাত প্রজাকে এতদ্দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিয়াছেন, প্রবিনসিয়াল আয় ব্যয়, তাঁহার হস্তে যেরূপ সুনিয়মবিশিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যদি কাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, সর্ উইলিয়ম গ্রের কৃত এমন কোন্ কার্য্য আছে যে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া প্রশংসা করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন?

অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সর্ জর্জ কাম্বেল, মনুষ্যাকারে পিশাচ ছিলেন। আমরা পিশাচ বলিয়া তাঁহাকে বর্ণিত করি নাই। তিনি বহু দোষযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দোষের বর্ণনার অভাব নাই। যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে কি না, এ বিষয়ের সমালোচনার ফল আছে—যে এক চক্ষে দেখে, সে অর্দ্ধেক অন্ধ। এ প্রস্তাবের জন্য যদি কেহ রাগ করেন, আমাদের আপত্তি নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে লিখিত হয় না; কোন শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে, এ পত্রের লেখকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্ত্তমান লেখক সর্ জর্জ কাম্বেল কর্ত্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা সর্ উইলিয়ম গ্রে কর্ত্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন; যাহা লিখিত হইল, সত্যানুরোধেই লিখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে। যদি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা হইল। শ্রীভজরাম।—'বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, পৃ. ৭৩-৮২।

# বঙ্গে দেবপূজা

## প্রতিবাদ

কার্ত্তিক মাসের ভ্রমরে শ্রীঃ স্বাক্ষরিত "বঙ্গে দেবপূজা" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার কথা আছে।

শ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রতিবাদ করিতে গেলে যে সময় লাগে, তাহা আমার নাই; এবং যে স্থান লাগে, তাহা ভ্রমরের নাই। কিন্তু কথা সহজ—সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

তাঁহার স্থূল কথা এই যে, পৌত্তলিক মত সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে, দেশের বিশেষ উপকার আছে। কি কি উপকার?

তিনি, প্রথম উপকার এই দেখান যে, দেবসেবার অনুরোধে সেবক ভাল খায় পরে। এবং এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৈষ্ণবের বাড়ী ব্রাহ্ম অতিথির উদাহরণ দিয়াছেন। শ্রীঃ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা ঠাকুরপূজা করে না, তাহারা কি কখন ভাল খায় পরে না? শ্রীঃ মহাশয় কি কখন সাহেবদিগের আহার দেখেন নাই, তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়। হিন্দু পুত্তল পূজা করে, ইংরেজ করে না; ইংরেজ ভাল

খায়, না হিন্দু ভাল খায়? ইংরেজ। তবে আহারাদির পারিপাট্য যে ঠাকুরপূজার ফল নহে, তাহা শ্রীঃ মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি হয়ত বলিবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গালি এমনি জাতি যে, যাহা কিছু ভাল খায়, তাহা ঠাকুরের অনুরোধে, ঠাকুর না থাকিলে খাইত না। এ কথা মিথ্যা। অনেক ঘোর নাস্তিক উৎকৃষ্ট আহার করে, এবং অনেক দৃঢ় ভক্ত কানাইয়ালালকে এমন কদন্ন ভোগ দেয় যে, তাহার গন্ধে ভূত প্রেত পলায়। স্থূল কথা এই যে, যাহার শক্তি ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খায়। যে এখন ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাল খায় বা খাওয়ায়, সে পৌত্তলিক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকারটি বঙ্গমহিলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। লিখেন, "প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের ফলিতেছে।" শ্রীঃ মহাশয়, সে ফল কি আপনি জানেন? সে ফল পুরুষোত্তম, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রকটিত আছে। ঈশ্বরসান্নিধ্য হিন্দু মহিলার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে পাপ করিবার স্থান বলিয়া পরিচিত!

তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আন্তরিক হয়, নিরাকারে তত হয় না। কে বলিয়াছে? কেন হয় না? যাহাকে চাক্ষুষ মাটি বা পাতর দেখিতেছি, তাহার কাছে যদি আন্তরিক কাঁদিতে পারি, তবে যাঁহাকে চক্ষে দেখিতেছি না, কিন্তু মনে জানিতেছি—তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন তাঁহার কাছে আন্তরিক কাঁদিতে না পারিব? কেন সেইরূপ সান্ত্বনা লাভ না করিব? শ্রীঃ, যুবতীর মুখে যে কয়টি কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়েলি কথা বলিয়া উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। যুবতী স্ত্রীবুদ্ধিতে অলীক কথা বলিয়াছে, ভক্ত নিরাকারবাদীর অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে না বলিয়া বলিয়াছে। দেবতার কাছে আছি বলিয়া তাহার যে সুখ, যে সাহস, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের কাছে আছি বলিয়া নিরাকার ভক্তেরও সেই সুখ, সেই সাহস। বিশ্বাসের দার্ঢ্য থাকিলে সাকার নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই।

তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, বিশ্বাস দেবতার উপর। যদি বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িলেই দেবতারা পদচ্যুত হইতে পারেন।

চতুর্থ উপকার, উৎসব, যথা দুর্গোৎসবাদি। জিজ্ঞাসা করি, এই হতভাগ্য, অন্নক্লিষ্ট, বৃথা হট্টগোলে ব্যতিব্যস্ত বঙ্গসমাজে এতটা উৎসবের কি প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কঠিন-হৃদয়, ভোগপরাঙ্মুখ, উৎসববিরত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে ভারতবর্ষের কি উদ্ধার হইবে?

পঞ্চম, শ্রীঃ বলেন, এই উপধর্ম্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন; এ বন্ধন রাখিয়া সমাজ রক্ষা কর। বঙ্গসমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমাজ ভঙ্গ করা, বিচলিত, বিপ্লুত করারই প্রয়োজন

হইয়াছে; এই খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গোরুর দড়ি আর আমাদের গলায় রাখিও না। যদি দেবতাপূজাই এই নরকতুল্য সমাজের মূল গ্রন্থি হয়, তবে আমি বলি যে, শীঘ্র শাণিত ছুরিকার দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক।

রূপক একটি ভ্রমের কারণ। "বন্ধন" শব্দটি ব্যবহার করিলে লোকে মনে করিবে, "বড় আঁটাআঁটি—দড়ি ছাড়িস না, বাঁধন ঠিক রাখিস।" বস্তুতঃ সমাজবন্ধন মানে কি? শ্রীঃ কি মনে করেন যে, দেবতার পূজা উঠিয়া গেলেই সমাজ খসিয়া পড়িবে, সমাজের লোকসকল সমাজ ছাড়িয়া গোশালাবিমুক্ত গোরুর ন্যায় বনের দিকে ছুটিবে? তাহা নহে। আসল কথা, এই দেবতাভক্তি বঙ্গসমাজের একটি ধর্ম্মভিত্তি। এ ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেলে ধর্ম্মের অন্য ভিত্তি হইবে; সমাজ নষ্ট হইবে না। যত দিন না নূতন ভিত্তি পত্তন হয়, তত দিন কেহ এই ভিত্তি বিনষ্ট করিতে পারিবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (public opinion) এবং উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রজনিত নূতন ভিত্তি চারি দিকে স্থাপিত হইতেছে। শ্রীঃ বলেন, "ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের নিমিত্ত বাঙ্গালা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাৎ।" ইত্যাদি। পুত্তলপূজা ভিন্ন যে ভক্ত্যাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্য মূল নাই, এ কথা এরূপ অমূলক এবং অশ্রদ্ধেয় যে, ইহার প্রতিবাদ আবশ্যক করে না।

আমি সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে, শ্রীঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারকা মনে করেন, তাহা কেবল তাঁহার ভ্রান্তি। সকল ভ্রান্তি দেখাইতে গেলে তিন নম্বর ভ্রমর আমাকেই ইজারা করিতে হইবে। কিন্তু বিচারার্থ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, কোন কোন বিষয়ে সাকার-পূজা উপকার করে। তাই বলিয়া কি সাকার-পূজা অবলম্বনীয়? এ জগতে এমন অপকৃষ্ট সামগ্রী কি আছে যে, তদ্দ্বারা কোন-না-কোন উপকার নাই। মদ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ; অনেক বিষে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়; তাই বলিয়া কি মদ্য এবং বিষ নিত্য সেবা করা কর্ত্তব্য? কয়েদী জেলে গিয়া পরের খরচে খাইতে পায়, তাই বলিয়া কি কারাবাস কামনীয়? অপুত্রকের ব্যয় অল্প, সেই জন্য কি অপুত্রকতা কামনীয়? অনেক স্ত্রীলোক অসতী হইয়াই পুত্রবতী হইয়াছে; তাহাতে কি অসতীত্ব ইষ্ট বস্তু হইল? সাকার-পূজায় কিছু কিছু উপকার আছে বলিয়াই কি সাকার-পূজা প্রচলনীয় বলিয়া সিদ্ধ হইল?

সকলেরই কিছু শুভ ফল আছে, সকলেতেই কিছু অশুভ ফল আছে। শুভাশুভের তারতম্য বিচার করিয়া কোন্‌টি কামনীয়, কোন্‌টি পরিহার্য্য, মনুষ্যে বিচার করে। একটি গেল, তাহার স্থানে আর একটি হইল; যেটি ছিল, তাহার যে সকল শুভ ফল, তাহা আর রহিল না; কিন্তু যেটি হইল, তাহার জন্য নূতন কতকগুলি শুভ ঘটিবে। এইগুলি যদি পূর্ব্ব শুভের অপেক্ষা গুরুতর হয়, তবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাকার-পূজার শুভ ফল অনেক

থাকিতে পারে, কিন্তু নিরাকার-পূজার শুভ ফল যে তদপেক্ষা গুরুতর নহে, তাহার আলোচনায় শ্রীঃ একেবারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

যখন এদেশে রেলের গাড়ী ছিল না, তখন ভ্রমণ—পদব্রজে, নৌকায় বা পাল্‌কীতে করিতে হইত। নৌকা বা পাল্‌কীতে যাতায়াতের দুই একটি সুফল ছিল—তাহা বাষ্পীয় যানে নাই। নৌকাযাত্রা স্বাস্থ্যকর। যে দেশ দিয়া রেইল গাড়ীতে যাও, তাহার কিছুই দেখা হয় না, গড়গড় করিয়া তাহা পার হইয়া যাও। পাল্‌কীতে বা পদব্রজে গেলে সকল দেশ দেখিয়া যাওয়া যায়; তাহাতে বহুদর্শিতা এবং কৌতূহল নিবারণ লাভ হয়। তাই বলিয়া যে বলিবে, রেলগাড়ী উঠাইয়া দাও, দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাকে শ্রীঃ কিরূপ বোদ্ধা বলিয়া গণ্য করিবেন? নিরাকারভক্তও তাঁহাকে সেইরূপ বোদ্ধা বলিয়া মনে করিতে পারে।

তিনি সাকার-পূজার গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন; দোষ একটিও দেখান নাই। তাহার দুই একটি অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। উল্লেখ মাত্র করিব।

প্রথম, সাকার ধর্ম্ম বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকার ধর্ম্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর—"দেবতায় করেন।" অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার-পূজা জ্ঞানোন্নতির কণ্টক।

যদি কেহ বলেন যে, অনেক যুনানী এবং অনেক আর্য্য পণ্ডিত জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি সাকারবাদী ছিলেন না? উত্তর, না—কেহই না। যুনানী তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবেত্তৃগণ, এবং আর্য্য মহর্ষিরা, যাঁহারা কিছু জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন। সাকারবাদী কর্ত্তৃক জ্ঞানের উন্নতি প্রায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয়। সাকার-পূজা স্বানুবর্ত্তিতার বিরোধী। চারি দিকে মনুষ্যচিত্তকে বাঁধিয়া, মনুষ্যচরিত্রের স্ফূর্ত্তি, উন্নতি এবং বিস্তৃতি লোপ করে।

তৃতীয়। জ্ঞান এবং স্বানুবর্ত্তিতার গতি রোধ করিয়া, এবং অন্যান্য প্রকারে সাকার-পূজা সমাজের গতিরোধ করে।

পক্ষান্তরে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সাকার-পূজার একটি গুরুতর সুফল আছে, শ্রীঃ তাহা ধরেন নাই। সাকার-পূজা কাব্য এবং সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক। সাকারবাদীদিগের প্রধান কবিদিগের তুল্য কবি, নিরাকারবাদীদিগের মধ্যে একজন মাত্র আছেন—একা সেক্ষপিয়র। বঙ্গদেশেও সাকার-পূজার ফল—বৈষ্ণব কবিদিগের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য।

শ্রীঃ সাকার নিরাকারের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা, তাহার মীমাংসা করেন নাই; আমিও তাহা করিব না। বুঝি বিচার করিতে গেলে দুয়ের একটিও টিকিবে না।

ভক্তিতে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তর্কে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর কাহাকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি দুইটির মধ্যে একটি প্রকৃত হয়, তবে যেটি প্রকৃত, সেইটি প্রচলিত হওয়াই কর্ত্তব্য; অপ্রকৃতের সহস্র শুভ ফল থাকিলেও তাহা প্রচলিত হওয়াই অকর্ত্তব্য। যদি সাকার-পূজাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয়, তবে তৎপ্রদত্ত উপকার-সকল এক এক করিয়া গণিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাতে কোন উপকার না থাকিলেও, সহস্র অনুপকার থাকিলেও তাহাই অবলম্বনীয়। আর যদি তাহা না হইয়া নিরাকার প্রকৃত ঈশ্বরস্বরূপ হয়, তবে সাকার-পূজায় সহস্র উপকার থাকিলেও, নিরাকার-পূজায় কোন ইষ্ট না থাকিলেও, সাকার-পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ, সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি। বঃ—'ভ্রমর,' অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ. ১৮১-৮৭।

## কল্পতরু*

গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র। মনুষ্যচরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থবিস্মৃত, পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্‌গুণের ভাগই অধিক, অসদ্‌গুণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদ্‌গুণের ভাগ অল্প, অসদ্‌গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্যহৃদয় বিভক্ত।

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন২ কবি, এক এক ভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের

* কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রেরি। ১২৮১।

ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্২ করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্যচরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশ মাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিক্টর হ্যুগোর গদ্যকাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্যলেখক। ইঁহাদিগের চূড়ামণি সর্ বল্টিস্। ইঁহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও অসম্পূর্ণ কাব্য।

এই সম্প্রদায়ের কেবল দুই জন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত ; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর ; দ্বিতীয় হুতোম পেঁচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্য্যে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে২ প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লাগিরিতে" প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর ; সর্ব্বদা সহনীয়। "কল্পতরু" বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এ গ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী, বাচাল, "চালাকদাস" দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্ব্ব কালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও

মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চূড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়—পাঠক স্বয়ং লইবেন।

এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্য্যই আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই, যে আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট নহে।

মনুষ্যহৃদয়ের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থমধ্যে একবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ—তদ্ভিন্ন গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদ্‌গুণ নাই। মনুষ্যহৃদয়ের সদ্‌গুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে।

গল্পটি অতি সামান্য; সহজে বলিতে ছত্র দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চ নীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। আলালের ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্যচরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। কল্পতরুর অপেক্ষা আলালের ঘরের দুলালের সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া লেখকের লিপিপ্রণালীর পরিচয় দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা করি, অন্যান্য গুণে প্রীত হইয়া পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন।

"মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্‌রির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতি বার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক, সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজদেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন

নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপ জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি, ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

'একে পিসী, তায় বয়সে বড়,' সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের 'পরমারাধ্য পরমপূজনীয়' পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায়, দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায় পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে, অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাকঝাড়াতে উঠান সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন; সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

একদিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের

বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন ; কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল ; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে'—যাহাকে দেখে, এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পঁহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য ; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে—'অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহারই মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয় ; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে, এক-ভাবে বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'বেটী বসে কাঁদ্ছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।'

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটি একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

'আহা, বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়! ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—' পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটি স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন ; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। 'নরেন আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন, তুই এক বার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই?'

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল, 'যা হয়েছে, তা ফের্বার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল ; কাঁদ্লে কি হবে। শুন্লে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা ব'ল্লে?'

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'ষাট্! ষাট্! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই; তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।'

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, এ কথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

'নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে, মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসীমা বলিলেন, 'জাত যা'ক, তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস' —নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল। অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।—'বঙ্গদর্শন,' পৌষ ১২৮১, পৃ. ৪১৫-২০।

## বৃত্রসংহার*

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন। পাতালে, বৃত্রজিত, নির্ব্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেম বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃতভাষা অগবত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা

* বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

বিচিত্র নহে।" হেমবাবু, মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড়ধূম্রল ঘোর" সেই পাতালপুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর—

চারি দিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন,
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ঘন ঘনচ্ছাস
বহে যুড়ি চারি দিক্ আলোড়ি সাগর।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ করি, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে;
দেবত্ব বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জলি।

"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?"

এই সর্গে অনেক স্থানে আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরুশিখরে নিয়তির আরাধনা করিতে-ছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীররসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দনবনে বৃত্রমহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত-পবনের মাধুর্য্যের ন্যায় একটি মাধুর্য্য আছে—কিসের সে মাধুর্য্য, পবন-মাধুর্য্যের ন্যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্রাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে২ ইহা মনে থাকে না, মর্ত্ত্যভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখন২ ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্ব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন **সহসা** প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্‌টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।—'বঙ্গদর্শন,' মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৭২-৭৩।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

### (সম্পাদকীয় উক্তি)

বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি

নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয়, অনবকাশ। আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য, সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। "বৃত্রসংহার" বা "কল্পতরু" বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর যে, আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয়, এমত চেষ্টা করিব।

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন২ গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বপ্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।—'বঙ্গদর্শন,' মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৮০।

## জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত*

ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ আমাদিগকে বলে যে, তোমরা এত বড়াই কর, কিন্তু কোন্ বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীবাসী অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমরা আর কিছু বলিতে পারি বা না পারি, ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ইহাই বাঙ্গালিদিগের জাতীয় গৌরব। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে

* ন্যায় পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—ততই দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে,—স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থা-শাস্ত্রে,—ঐশ্বর্য্যে বাহুবলে একদিন ভারতভূমি ভূমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরবে বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্যকুব্জাদির ন্যায় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যমপ্রকার—জয়দেব গোস্বামী ইহার চূড়া। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপত্য জন্য ফর্গুসন সাহেব ভারতবর্ষীয়গণকে ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশে তাহা প্রচুরতর। যে সংগীতের জন্য সে দিন আলদিস্ সাহেব, ভারতবর্ষকে পৃথিবীশ্বরী বলিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয়। উদয়নাচার্য্য বোধ হয় বাঙ্গালি। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, গদাধর তর্কালঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গালি। গৌতম, কণাদ কোন্ দেশবাসী, তাহা নিশ্চিত করিবার কোন উপায় নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী প্রধান নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ মার্জ্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবদ্বীপে, বাঙ্গালির প্রধান কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির জন্মভূমি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যুদয়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়—নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর—কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত—আর নবদ্বীপেই সপ্তদশ পাঠানকৃত বঙ্গবিজয়!

—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৭-৮৮।

## ঋতুবর্ণন*

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক

* ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য—স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতির সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর, তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই, সেই আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈম কিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতিপ্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতিপ্রকৃত, কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানবস্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতি দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার-প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোক-চিত্র ইহার উদ্দেশ্য।—'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮২, পৃ. ২১-২২।

# পলাশির যুদ্ধ*

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না, ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।† যাহা হউক, মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীনবাবুর গ্রন্থের কথা বলি।...

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক

---

* পলাশির যুদ্ধ। ( কাব্য ) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

† আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়েং এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে, একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে, আর্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর্য্যে বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য আমরা সে বার লিখিয়াছিলাম যে, শকুন্তলা মিরন্দায় যেখানে সদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী! আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনাকালে, লেখক যে সকল পচা পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বিত পুনশ্চর্ব্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে।" কি দুঃখ!

এই স্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

সম্পাদিত ; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক ; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এ স্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য সঙ্ঘটন করা কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেই জন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুই জনের এক জনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুই জনের এক জনের কাব্যে তাহার কিছু মাত্র নাই। কিন্তু অন্য দিকে দুই জনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীন বাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

* * * *

But mine was like the lava flood
    That boils in Etna's breast of flame.
I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain :
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain.
If bursting heart, and madd'ning brain,
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign.*

* The Giaour.

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরণের ন্যায় নবীন বাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই নবীন বাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।—'বঙ্গদর্শন,' কার্ত্তিক ১২৮২, পৃ. ৩১৯-২৭।

## বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ

চারি বৎসর গত হইল, বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য

আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ-পূর্ব্বক আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেন না, এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যত দিন বাঁচিব, এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ শালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত২ ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহু কাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত নহে। দেশী সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের

---

* বাহুল্যভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য আমি শত২ ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।—'বঙ্গদর্শন,' চৈত্র ১২৮২, পৃ. ৫৭৪-৭৬।

## বঙ্গদর্শন

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক, অন্যতঃ হউক, বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।

যাহা এক জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম, তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন, দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা, বঙ্গদর্শনকে সুশিক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্ররূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনি সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখক। ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার

সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না। যত দিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে২ উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্দ্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*—'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮৪, পৃ. ১-৩।

## সূচনা

আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা বলিবার জন্যই এই সূচনাটুকু আমরা লিখিলাম।

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বল্মীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বান্‌চাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।

দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার;—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতা, এবং গাম্ভীর্য্যে কল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কণ্টেম্পোরারি বা নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব

---

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জীবন কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সম্ভবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে অল্প লোকই ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাঁহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থ-চিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত,—এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তার পর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিস্তারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তাপোশের নীচে পড়িয়া যায়। স্রুয়মান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে বালকেরা তাহা অধিকৃত করিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া, ল্যাজ বাঁধিয়া দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয় ;—হেম বাবু, রবীন্দ্র বাবু, নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র ; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচনা, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবন-পথে উত্থানপূর্ব্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে, এবং ছয় ফর্ম্মার স্থানে তিন ফর্ম্মা আদেশ করিয়া **'প্রচার'** যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না ; গত্যন্তরও বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফর্ম্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে ; এবং পাকশালের কার্য্যনির্ব্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে, গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে।

তার পর টাকার কথা। বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা—অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে স্বভাবতঃ শঠ, বঞ্চক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপূর্ব্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাঁকি দেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সকলের তিন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই দেন না। যাঁহারা তিন টাকা দিতে পারেন না, তাঁহারা দেড় টাকা দিতে পারিবেন, এমত বিবেচনা করিয়া আমরা এই নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত ভস্মরাশির উপর আবার এ নূতন ছাইমুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি? সাময়িক সাহিত্য যদি আমরা ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ কার্য্যে হাত দিতাম না। আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্ভ-নিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা না থাকিলে লেখক ও ভাবুকদিগের প্রত্যেককে এক একখানি নূতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহুসংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচারপক্ষেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই আমরা সর্ব্ব-সাধারণ-সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে "নবজীবন" নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। **'সত্য, ধর্ম্ম'** এবং **'আনন্দের'** প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম **"প্রচার।"**

যখন সর্ব্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য যে, প্রচারের প্রবন্ধগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকেরা এ বিষয়ে কত দূর মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না—আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে, ইহা বলিতে পারি। কাজটা কঠিন, কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এমন ভরসা অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করিব না। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপণ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্য ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের পড়িবার বা বুঝিবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিয়াছেন। ভিতরে সর্ব্বত্রই মনুষ্য-প্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, অজ্ঞানীকে যতটা

ঘৃণা করি, বোধ হয়, ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে।

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও কীটাণুমাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সকল অসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়মলঙ্ঘনেরই ফল।—'প্রচার,' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১-৬।

# আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম "একটি পুরাতন কথা।" বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে), তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ-স্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্ব্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে "নবজীবন" প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল, পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম্ম—যে হিন্দু ধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ।

গড়পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পর্দ্দা পর্দ্দা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয়, বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় "নূতন ধর্ম্মমত" ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে, তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। উহাতে "নাস্তিক," "জঘন্য কোম্‌ত মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রযুক্ত ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"-প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য, উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ

সাধিত হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা) ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে এক জন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি, ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের এক জন ভৃত্য—নাএব, কি—কি, আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইঁহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্‌স্‌মূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না।"* নব্যভারত—ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা।

এখন এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার

* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে, প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাঁহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা, তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাষা এত দূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। স্থুর কেমন পর্দ্দা পর্দ্দা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [ স্থুর ] লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন ; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য* লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। ( ভারতী—অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃ. )

সর্ব্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

---

* বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটী কিরূপ শুনিয়াছিলেন ?

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্য্যন্ত ; তার পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না ; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি, আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণস্বরূপ "একটি আদর্শ হিন্দু-কল্পনা" সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে ?

এই দুইটি কথা "অসত্য" বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। "যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।" এ কথার কোন অর্থ আছে কি ? যদি বলা যায়, "একটা চতুষ্কোণ গোলক।" তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা

অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি
খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি,
যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়?
যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।
তিনি বলিবেন, "এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক
নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত
প্রয়োজনীয়।" ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয়
একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্র বাবু তাহা পড়িয়া
দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার কথার
ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, "অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি
কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।"
কাজটা রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত
হয়। তার পর অনেক বার রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতি বার অনেক ক্ষণ
ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কথাবার্ত্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এত দিন কথাটা
জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্র বাবুর
অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন
সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন,
অর্জ্জুন এত ক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কি না। অর্জ্জুন বলিলেন—না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ
হইয়া অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন।
অর্জ্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন।
কাজেই এক্ষণে "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য"-
চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তার পর
প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন
যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে
মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয় একটু বুঝাই।

রবীন্দ্র বাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, *Truth*, মিথ্যা, *Falsehood*। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায় আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। "সত্য" "মিথ্যা" প্রাচীন কাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—"*Troth*"। ইহাই *Truth* শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন *Truth* শব্দ *Troth* হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। *Honour*, *Faith*, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা *Truth*—রবীন্দ্র বাবুর Truth, তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ-প্রতিজ্ঞা ( সত্য ) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্র বাবু "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন ?" এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্র বাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জনমধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল, প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেক বার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই! অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক

শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব, এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, "Lie direct" সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না।* দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—'প্রচার,' অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৬৯-১৮৪।

---

* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

# আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা সঙ্কল্প করা যায়, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রচার কেবল ধর্ম্মবিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে ইহাতে এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না।

ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু প্রচারের বর্ত্তমান ক্ষুদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অথবা তাহার অল্পতা করিতে পারি না। কাজেই প্রচারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে। কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, আমরা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রচার সম্পাদিত করিতে পারিব।

১। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ হইতে থাকিবে। এখন যাঁহারা তাহা লিখিতেছেন, তাঁহারাই তাহা লিখিবেন।

২। স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। "সীতারাম" বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩। এতদ্ভিন্ন সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।

এই সঙ্কল্প পাঠকদিগের অনুমোদিত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। কেন না, পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে কাজেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য দুই মাস অগ্রে পাঠকদিগকে সম্বাদ দিলাম। পত্রের কলেবর এবং মূল্য কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন।—'প্রচার,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ. ৩৬১-৬২।

# মাসিক সংবাদ

গঙ্গাতীরে পাটনা নামে কোন নগর আছে। তথায় কর্ক্‌ড নামা প্রথিতযশা অতি জ্ঞানবান্ এক বিচারপতি জনসমাজের প্রতি কৃপা করিয়া মাসিক আড়াই হাজার টাকা মাত্র বেতন লইয়া বিচার বিতরণ করিতেন। তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্র পবিত্রিত হইতেছিল। একদা বুধিয়া নাম্নী অপ্রাপ্ত-যৌবনা কাচিৎ কুমারী তাঁহার বিচারাগারে বিচার প্রার্থিত হইল। বলিল—"ধর্ম্মাবতার! গুরুচরণ দোসাদ নামে চোর, আমার ঘটি বাটি চুরি করিয়াছে।" বিচারনিধান এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভাবনীয় অঘটনীয় সম্বাদ শ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—"কালের কি বিচিত্র গতি! হায়! কুমারীর ঘটি বাটি চুরি! এমন কি হয়!" মলিম্লুচ যুক্তপাণি হইয়া বিচারাসনতলে নিবেদন করিল—"হে ধর্ম্মস্বরূপ! এমন কি হয়! বরং আকাশে স্তরে স্তরে সহস্রদল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে—বরং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইতে পারে, বরং হিমালয়-শিখর-দেশে যূথে যূথে মকর কুম্ভীর সন্তরণ করিতে পারে, তথাপি হে ধর্ম্মস্বরূপ! কুমারীর কখন ঘটি বাটি চুরি যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার! এই দুশ্চারিণী বুধিয়া ঘোরতর অসতী—ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" তখন বিচারাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের কল্লোল সমুত্থিত হইল—"রে মলিম্লুচ! সাধু সাধু! এ অতি সঙ্গত কথা। আমি অনন্ত জ্ঞানী বিচারক; আমি অচিরেই পরীক্ষার দ্বারা এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিব।" তখন ধন্বন্তরির প্রতি মহাবিচারক আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "বিবস্ত্র করিয়া এই দুশ্চারিণীকে পরীক্ষিত কর।" দুশ্চারিণী পরীক্ষিতা হইয়া চরিতার্থ হইল। কিন্তু কালের কি অনন্ত মহিমা! সেই প্রদেশে "বেহার হেরল্‌ড" নামে অতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস ধর্ম্মহিংসা করিয়া দিন যাপন করে। সেই মহাধনুর্দ্ধর, পাটলিপুত্র নগরে এইরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতারণা শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধভরে বিচারপতির প্রতি এমন এক শর প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা ত্যাগে এক মুদ্রাঙ্কণে সহস্র, পতনকালে লক্ষ, এবং সংহারকালে কোটি কোটি হইয়া পড়িল। প্রথিতযশা বিচারনিধি শরজালে বিদ্ধ হইয়া, বিচারাসন হইতে ভূপতিত হইলেন। ইতি কর্ক্‌ড-বধ।

He comes, nor law, nor justice his course delay<br>
Hide! blushing Glory, hide Budhia's day.<br>
The vanquished hero leaves his broken bands,<br>
And shows his misery in distant lands.<br>
His fate was destined on Patna's sand,<br>
A petty niggeress, and a Baboo's hand!

* * *

কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া দিল; অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্য সহ স্ত্রীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃত বোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অম্লরসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল—"এখন অম্বল থাকুক, আগে ও মাছটি খান।" গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"উটি যদি না খান ত আপনার বেটার মাথা খান।" আমরাও চণ্ডী বাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।—'প্রচার,' শ্রাবণ ১২৯৫, পৃ. ১৫৪-৫৫।

# পত্রাবলী

[ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত ]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর, যে উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে··যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্ব্বমত দিক্‌পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ [ ১২৮৯ সাল। ১৬ এপ্রিল, ১৮৮২ ]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' ]

[ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত ]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। * * * সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার

বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষ্যাপরবশ, আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, "বন্দে উদরং"।

বৈশাখের "বান্ধব" পাইয়াছি। এবং "মূলমন্ত্র" "জাতীয় সঙ্গীত" এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও "শাপেনাস্তংগমিতমহিমা," শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্ত্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণীসৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী" সে ব্যক্তি নিশ্চয় জানিত উড়িষ্যার বৈতরণীপারেই যমদ্বার বটে।

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।

আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ [ ১২৮৯। ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ ]

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' ] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত ]

প্রিয়তমেষু—

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি।

আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি ( নবজীবনে ও প্রচারে ) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় ( যথা William the Silent ) ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন [ ১২৯২। ১০ অক্টোবর ১৮৮৫ ]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'প্রদীপ' ]

[ গিরিজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত ]

সাদর সম্ভাষণম্—

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন. তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা, যে আমার প্রণীত নরনারী-চরিত্রগুলি আপনাদিগের এত দূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেন না আপনার বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

চন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু আপনার সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। * * * ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ [ ১২৯৩ ] [ ২৪ মে ১৮৮৬ ]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ

'বঙ্কিমচন্দ্র' ]

[ ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ]

[ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ ] ৮।৬।৮৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তিনকড়ি বাবুর নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুস্তক ধর্ম্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়,তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জিনে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব।

'ভূদেব-চরিত' ]

[ ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ]

৫ নং প্রতাপ চাটুয্যার গলি
কলিকাতা—১৩ জুন [ ১৮৮৮ ]
[ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ ]

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে ষ্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং অনুরুদ্ধ না হইয়াও পড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তকগুলি যেরূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি, এক রকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং আবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল, তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।

গীতা পুনশ্চ প্রচারে প্রকাশিত হইতেছে। যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তবে, আমরা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয় দেখিতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সৌজন্যে ]

[ রাজকৃষ্ণ রায়কে লিখিত ]

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে; (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর; আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি

তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

'কল্কিপুরাণ' : রাজকৃষ্ণ রায় ]

[ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ]

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন।

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত, এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যত দূর জানি, এ দেশীয়া বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে, বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য, যে, দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বামিসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার-বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইনমতে সম্মতিদানের [ বয়স ] দশ বৎসর ; দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি, অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

আমার মতে, আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

ইতি তাং ২৯ আশ্বিন [ ১২৯৮ ]

'সচিত্র শিশির,' ১৩৩১ ] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্ব্বাদভাজনেষু

আপনি আমাকে যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রবাবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার আসন

গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারবশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। অপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া, বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and Moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে,

সমুদ্রযাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যত দিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, তত দিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কত দূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে, ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালী সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্ রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজ-সম্মত ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে;—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

কর্ণপর্ব্ব, একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম্ম লোকসকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর, তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্রযাত্রা-পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও, কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে,—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে যেরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৮৯২
'সঞ্জীবনী,' ২৩ শ্রাবণ ১২৯৯ ]

[ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ]

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর, ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে"। অন্যে এ কথা বলিলে তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণস্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন যে ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episodeগুলির সহিত তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছিলেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী-চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌষ ১৩০০ [ ২ জানুয়ারি ১৮৯৪ ]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে ]

[ তারাকুমার কবিরত্নকে লিখিত ]

প্রিয়বরেষু,

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা পড়িলাম। কয়টিই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলাটুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে [ মানকুমারী বসু ] সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম। ১৩ই মাঘ ১৩০০ সাল।

# গ্রন্থপঞ্জী

[ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত ]

গ্রন্থপঞ্জীতে বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল
বঙ্গীয় সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সঙ্কলিত
মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
|---|---|---|
| ইং ১৮৫৬ | **ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।** | পৃ. ৪১ |

"তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।" ( বিজ্ঞাপন )

| | | |
|---|---|---|
| ইং ১৮৬৫ | **দুর্গেশনন্দিনী।** ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। | পৃ. ৩০৭ |
| সংবৎ ১৯২৩ [ ইং ১৮৬৬ ] | **কপালকুণ্ডলা।** | পৃ. ১২৪ |

ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| সংবৎ ১৯২৬ [ ১০-১১-৬৯ ] | **মৃণালিনী।** | পৃ. ২৪১ |

"1871" খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইংরেজী আখ্যা-পত্র সম্বলিত ২৪১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি সংস্করণ আমরা পাইয়াছি; তাহার বাংলা আখ্যা-পত্রে কিন্তু "সংবৎ ১৯২৬" ছাপা আছে। সম্ভবতঃ ১ম সংস্করণের পুনর্মুদ্রিত বাংলা আখ্যা-পত্র সম্বলিত এইটিই ২য় সংস্করণ।

| | | |
|---|---|---|
| ১২৮০ সাল [ ১-৬-৭৩ ] | **বিষবৃক্ষ।** | পৃ. ২১৩ |

১২৭৯, বৈশাখ-ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

| | | |
|---|---|---|
| ১২৮০ সাল [ ২৫-৮-৭৩ ] | **ইন্দিরা।** উপন্যাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। | পৃ. ৪৫ |

১২৭৯, চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তক ( ১৮৯৩, পৃ. ১১১ ) "পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত"।

| | | |
|---|---|---|
| ১২৮১ সাল [ ২-৬-৭৪ ] | **যুগলাঙ্গুরীয়।** | পৃ. ৩৬ |

১২৮০ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

| | | |
|---|---|---|
| ইং ১৮৭৪ [ ২৬-১১-৭৪ ] | **লোকরহস্য।** ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। | পৃ. ৯৯ |

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ( পৃ. ১৭৪ ) প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
| --- | --- | --- |

পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

ইং ১৮৭৫ [১৯-৪-৭৫] — **বিজ্ঞানরহস্য** অর্থাৎ ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ। — পৃ. ১৭০

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত আছে।

১২৮২ সাল [১-৬-৭৫] — **চন্দ্রশেখর।** উপন্যাস। — পৃ. ১৯৫

১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

১৮৭৫ [২-২-৭৬] — **কমলাকান্তের দপ্তর।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) — পৃ. ১৬২

১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওয়া আছে। ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫০) ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।..."চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।... কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে (জুলাই ১৮৯১) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
|---|---|---|

ইং ১৮৭৬ [ ১৬-৭-৭৬ ]

**বিবিধ সমালোচন।** ( বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত ) — পৃ. ১৪৪

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

১২৮৪ সাল [ ১৮৭৭ ]

**রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।** — পৃ. ১।।০

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১২৮৩ সালে ( এপ্রিল ১৮৭৭ ) দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর সহিত প্রকাশিত হয়।

১২৮৪ সাল [ ২-৬-৭৭ ]

**রজনী।** উপন্যাস। — পৃ. ১২২

১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।

ইং ১৮৭৭ [ ২৪-১১-৭৭ ]

**উপকথা।** অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ। — পৃ. ৮৩

ইহাতে 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দ্বিতীয় বার ( পৃ. ৮৫ ) মুদ্রিত হয়।

ইং ১৮৭৮ [ ১৮-৮-৭৮ ]

**কবিতাপুস্তক।** — পৃ. ১১২

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে ( পৃ. ১৪৪ ) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে'

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
|---|---|---|

প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। "দুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতা পুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।"

ইং ১৮৭৮ [ ২৯-৮-৭৮ ] — **কৃষ্ণকান্তের উইল।** — পৃ. ১৭০

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

? [ ২৭-৪-৭৯ ] — **প্রবন্ধ-পুস্তক।** — পৃ. ১৫৮

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল ; কেবল রাম শর্ম্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইং ১৮৭৯ [ ৬-২-৭৯ ] — **সাম্য।** — পৃ. ৬৮

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [ ১২৮০ ও ১২৮২ সালের ] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে [ ১২৭৯ সালে ] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

১২৮৮ সাল [ ৪-২-৮২ ] — **রাজসিংহ।** ক্ষুদ্র কথা। — পৃ. ৮৩

১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি ( পৃ. ৪৩৪ ) বর্ত্তমান আকারে "পুনঃপ্রণীত"।

১২৮৯ সাল [ ১৫-১২-৮২ ] — **আনন্দ মঠ।** — পৃ. ১৯১

১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

১২৯০ সাল [ ২৮-২-৮৪ ] — **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।** — পৃ. ৪৭

( ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত )

১২৯১ সাল [ ২০-৫-৮৪ ] — **দেবী চৌধুরাণী।** — পৃ. ২০৬

১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

ইং ১৮৮৬ — **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস।**

ইহাতে 'ইন্দিরা' ( ৪র্থ সং , 'যুগলাঙ্গুরীয়' ( ৪র্থ সং ), 'রাধারাণী' ( ৩য় সং ) এবং 'রাজসিংহ' ( ২য় সং ) একত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'উপকথা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ।

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
| --- | --- | --- |

ইং ১৮৮৬
[ ২৫-৬-৮৬ ]

**রাধারাণী।** পৃ. ৩৮

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত। ইহা ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত 'উপকথা'র দুইটি সংস্করণে এবং ১৮৮৬ সনে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে' ৩য় সংস্করণ-রূপে মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের এই অংশই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়—১৮৮৬ সনে। ১৮৯৩ সনে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি ( পৃ. ৬৫ ) পরিবর্দ্ধিত।

ইং ১৮৮৬
[ ১২-৮-৮৬ ]

**কৃষ্ণ চরিত্র।** প্রথম ভাগ। পৃ. ১৯৮

"কৃষ্ণচরিত্র…'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল…প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু…আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।…আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।" ( বিজ্ঞাপন )

১২৯৩ সাল
[ ৪-৩-৮৭ ]

**সীতারাম।** পৃ. ৪১৯

প্রথম তিন বর্ষের 'প্রচারে' ( ১২৯১-৯৩ ) প্রকাশিত।

১২৯৪ সাল
[ ৭-৭-৮৭ ]

**বিবিধ প্রবন্ধ।** প্রথম ভাগ। পৃ. ২৮০

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'—"দুই খানি পৃথক্ সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ

| আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা |
|---|---|---|

সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২৯৫ সাল [ ১৭-৫-৮৮ ] — **ধর্ম্মতত্ত্ব**। প্রথম ভাগ। **অনুশীলন**। — পৃ. ৩৫৯

পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে [ ১২৯১-৯২ ] প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

ইং ১৮৯২ [ ২৫-৫-৯২ ] — **বিবিধ প্রবন্ধ**। দ্বিতীয় ভাগ। ( বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত ) — পৃ. ৩৫৬

... — **সহজ রচনাশিক্ষা**।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।* ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক ( পৃ. ৩২ ) দেখিয়াছি।

... — **সহজ ইংরেজী শিক্ষা**।

ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।* এই পুস্তক আমরা এখনও দেখি নাই।

১৯০২ [ ১-১১-০২ ] — **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**। — পৃ. ৩৭৮ + ৯

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংগ্রহকারের নিবেদন"-স্বরূপ লিখিয়াছেন, "...'প্রচারে' [ শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩ ; বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৫ ] এই গীতিব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।...প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।..."

ইং ১৯৩৫ — **Rajmohan's Wife** — পৃ. ১৫৬

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় *Rajmohan's Wife* পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

---

* শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : "বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক"—'মানসী ও মর্ম্মবাণী,' কার্ত্তিক ১৩৩২।